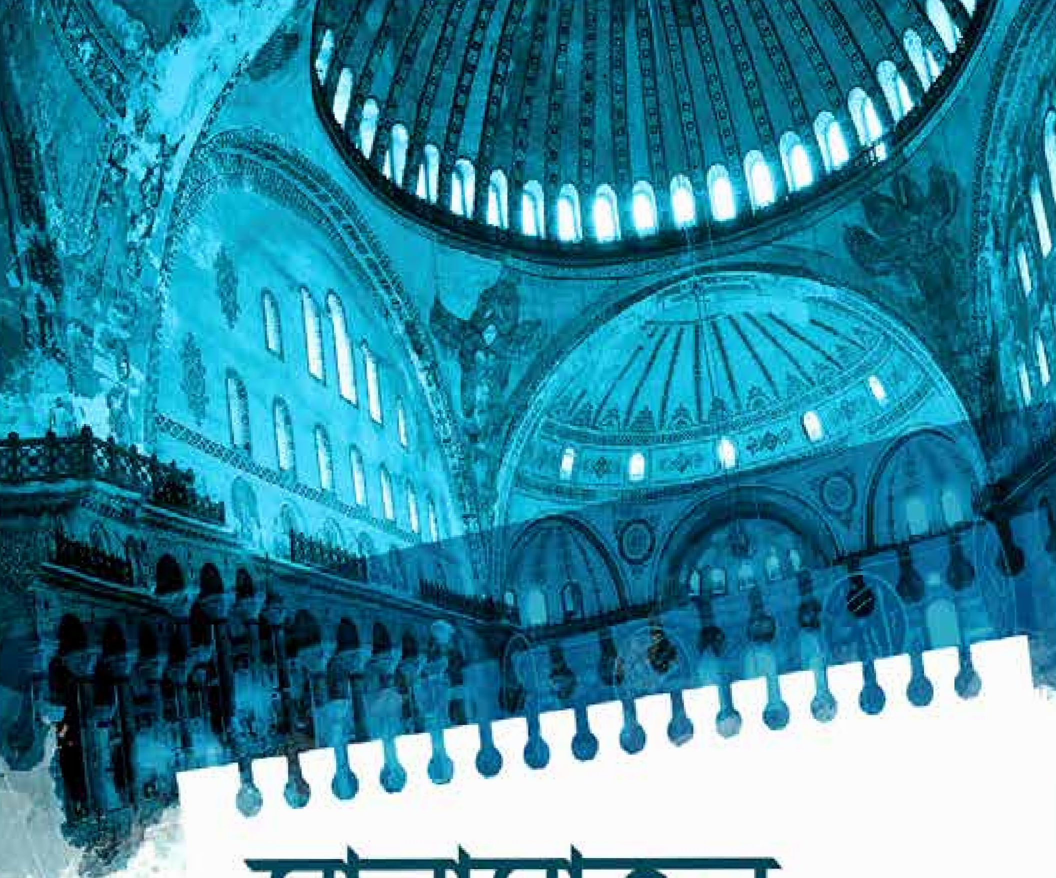


সালাসাতুল উসূল -এর ব্যাখ্যা

(তিনটি মূলনীতি বুঝার সহজ উপায়)

মূল: শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহ

ব্যাখ্যা: ড. মানসুর ইবনে মুহাম্মাদ আল-সাকউব হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদক : আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী

সালাসাতুল উসূল

এর ব্যাখ্যা

تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول

তিনটি মূলনীতি বুঝার সহজ উপায়

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

www.maktabatussunnah.org

maktabatussunnah19@gmail.com

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ২০২৩ হিজরী

নির্ধারিত মূল্য: ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

সালাসাতুল উসূল

এর ব্যাখ্যা

تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول

তাকরীবুল উসূল ইলা সালাসাতিল উসূল

[তিনটি মূলনীতি বুঝার সহজ উপায়]

تأليف: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

মূল: শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহ

لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى

ব্যাখ্যা: ড. মানসুর ইবনে মুহাম্মাদ আল-সাকউব হাফিযাহুল্লাহ

المترجم: عبد الله شاهد

অনুবাদ: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

দ্বিতীয় স্তর: ঈমান

তৃতীয় মূলনীতি: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জানা

হিজরত

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد:

সকল প্রশংসা বিশ্ব জগতের রব একমাত্র আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তার পরিবার পরিজন ও তার সকল সাহাবীর ওপর। অতঃপর,

ইসলামী আকীদা বিষয়ক কিতাবগুলোর মূল বক্তব্যসমূহের গুরুত্ব এবং তা বুঝার প্রয়োজনীয়তা ইলম অর্জনকারীদের কাছে মোটেই অস্পষ্ট নয়। আমাদের দেশের (সউদি আরব) আলেমদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি হলো, তারা সর্বপ্রথম শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ প্রণীত **তিনটি মূলনীতি** নামক সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি ছাত্রদেরকে পাঠ দান করেন। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের এটিই সর্বপ্রথম পাঠ করা উচিত। পরবর্তীতে তারা এর চেয়ে বড় কিতাবগুলোর দিকে অগ্রসর হবে। যেমন তাওহীদুল উলুহীয়ার ওপর লিখিত ‘কিতাবুত তাওহীদ’ এবং আকীদার সমগ্র বিষয়ের ওপর লিখিত ‘আল আকীদা আল ওয়াসেতীয়া’ এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমি প্রথমত মসজিদে উপস্থিত মুসল্লীদের জন্য “তিনটি মূলনীতি এবং তার প্রমাণসমূহ” নামক পুস্তিকাটির ব্যাখ্যামূলক দারস্ প্রদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করি। এরপর আমি তার নাতিদীর্ঘ ব্যাখ্যা লিখার কাজে হাত দেই। আমি এতে চেষ্টা করেছি যাতে, এমন সংক্ষিপ্ত যেন না হয় যে, পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হয় এবং যাতে এমন দীর্ঘ না হয় যে, পাঠকরা ক্লান্ত হয়ে যায়। মূলত আমি শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের বাক্যগুলো সহজ করতে চেয়েছি এবং এর অর্থগুলো পরিষ্কার করে বুঝাতে চেয়েছি। শিক্ষার্থীরা যেসব বিষয় অন্যান্য কিতাবে পেতে পারে, আমি সেগুলো এখানে উল্লেখ করিনি। শাইখের ব্যবহৃত বাক্যগুলোর সাথে যেসব বিষয়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে আমি এখানে কেবল সেগুলোই উল্লেখ করেছি। পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করা আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং মূল বক্তব্যগুলো বুঝানো এবং শিক্ষার্থীদেরকে এ সম্পর্কিত অন্যান্য কিতাবগুলোর দিকে নিয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য। আমি এ ব্যাখ্যাটির নাম রেখেছি, **تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول তিনটি মূলনীতি বুঝার সহজ উপায়:**

প্রিয় পাঠক ভাইদের সামনে ব্যাখ্যাটি পেশ করছি। আমি নিশ্চত যে, আমার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়; রয়েছে তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি। সংশোধনের

নিয়্যাতে প্রত্যেক সমালোচকের সমালোচনা খোলা মনে গ্রহণ করা হবে এবং প্রত্যেক উপদেশ দাতার উপদেশ গুরুত্বের সাথে শ্রবণ করা হবে। আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদেরকে আলেম ও ইলম অনুযায়ী আমলকারীদের কাতারে শামিল করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বত্তোম সাড়াদানকারী।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সমস্ত সাথীর ওপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। আমীন

ড. মানসুর ইবনে মুহাম্মাদ আল-সাকউব

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

পরিচয়, জন্ম ও প্রতিপালন:

তিনি হলেন শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন সুলায়মান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ আত্ তামীমী রহিমাহুল্লাহ। হিজরী **১১১৫** সালে তিনি নজদ অঞ্চলের উয়াইনা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি স্বীয় পিতার নিকট প্রতিপালিত হন। তাঁর পিতা, চাচা এবং দাদাসহ পরিবারের অনেকেই বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। সে হিসাবে তিনি একটি দীনি পরিবেশে প্রতিপালিত হন। সে সময় শাইখের পরিবারের আলেমগণ শিক্ষকতা, ফতোয়া দান, বিচারকার্য পরিচালনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দীনি দায়িত্ব পালন করতেন। এ সমস্ত বিষয় দ্বারা সম্মানিত শাইখ শৈশব কালেই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

শাইখের তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রাথমিক শিক্ষা:

তিনি উয়ায়নাতেই পিতাসহ স্বীয় পরিবারের আলেমদের থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিশুকালেই তার মধ্যে বিরল ও অনুপম মেধার নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর, বুঝশক্তি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ এবং চিন্তাশক্তি ছিল খুবই গভীর। এ কারণে তিনি অল্প বয়সেই ইলম অর্জনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। শৈশব কালেই তিনি সুদৃঢ় ঈমান ও দীন পালনের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ছোট বেলাতেই তিনি তাফসীর, হাদীস এবং বিজ্ঞ আলেমদের কিতাবগুলো প্রচুর অধ্যয়ন করতেন। আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং সালফে সালেহীনদের উক্তিসমূহই ছিল শাইখের জ্ঞান অর্জনের মূল উৎস। দর্শন, সুফীবাদ, মানতেক ইত্যাদির সংস্পর্শ থেকে শাইখ ছিলেন সম্পূর্ণ দূরে। কারণ তিনি যেই পরিবার ও পরিবেশে প্রতিপালিত হন, তা ছিল বিকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা, পাপাচার এবং কুসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

শাইখের যুগে আরব উপদ্বীপের অবস্থা:

শাইখের যুগে নজদ ও তার আশপাশের অঞ্চলে ব্যাপক আকারে শির্ক-বিদআত ও কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ে। আইয়্যামে জাহেলীয়াতের সকল প্রকার শির্ক যেন পুনরায় আরব উপদ্বীপে নতুন পোশাকে প্রবেশ করে। গাছ, পাথর, কবর এবং অলী-আওলীয়ার ইবাদত শুরু হয়। এ দৃশ্য দেখে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হন এবং এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সুদৃঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

শাইখের চারিত্রিক গুণাবলি:

আমানতদারী, সত্যবাদিতা, মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ, দানশীলতা, ধৈর্যশীলতা, দূরদর্শিতা, দৃঢ়তাসহ তার মধ্যে আরো এমনসব চারিত্রিক উন্নত ও বিরল গুণাবলির সমাহার ঘটেছিল, যা তাকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করে। ইতিহাসে যে সব মহাপুরুষ স্বীয় কর্মের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাদের খুব অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যেই এসব চারিত্রিক গুণাবলি বিদ্যমান ছিল। শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি খুব বিনয়ী ছিলেন, ভিক্ষুক ও অভাবীদের প্রয়োজন পূরণে বিশেষ তৎপর ছিলেন।

তাঁর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে কঠোরতা, অজ্ঞতা এবং দীন পালনে দুর্বলতা ইত্যাদি যেসব অভিযোগ করে থাকে, শাইখ ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

উচ্চ শিক্ষা ও ভ্রমণ:

উয়ায়নার আলেমদের কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করার পর তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য হিজায ও সিরিয়া ভ্রমণ করেন। যৌবনে পদার্পন করে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন। হজ্জ শেষে মদীনায় গিয়ে তিনি শাইখ আব্দুল্লাহ বিন ইবরাহীম বিন সাইফ নামক প্রখ্যাত আলেমের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধির নিকট ইলমে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। পরে তিনি ইরাকের বসরায় গমন করেন এবং সেখানকার শাইখ মাজমুয়ীর নিকট তাওহীদ ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন। সেখানে থাকা অবস্থাতেই তিনি শির্ক ও বিদআত বিরোধী প্রকাশ্য আলোচনা শুরু করেন। ফলে বসরার বিক্ষুব্ধ বিদআতীরা তাঁকে সেখান থেকে বের করে দেয়।

উয়াইনায় ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস এবং দাওয়াতী কাজে মনোনিবেশ:

ইরাক থেকে ফিরে এসে শাইখ নিজ জন্মস্থান উয়ায়নায় বসবাস করতে থাকেন। তখন উয়ায়নার শাসক ছিলেন উছমান বিন মুহাম্মাদ বিন মুআম্মার। তিনি উছমানের নিকট গেলেন। উছমান শাইখকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, আপনি আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে থাকুন। আমরা আপনার সাথে থাকবো এবং আপনাকে সাহায্য করবো। উছমান আরো বেশ কিছু ভালো কথা শুনালেন, শাইখের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করলেন এবং তাঁর দাওয়াতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করলেন।

আমীর উছমানের আশ্বাস পেয়ে শাইখ মানুষকে আল্লাহর দীন শিক্ষা দান, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ করাসহ কল্যাণের দিকে আহবান করতে থাকলেন। শাইখের দাওয়াত উয়ায়নার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে পার্শ্ববর্তী সকল গ্রামের মানুষ শাইখের কাছে আসতে থাকলো এবং নিজেদের ভুল আকীদা বর্জন করে শাইখের দাওয়াত কবুল করতে লাগল।

ঐ সময় জুবাইলা নামক স্থানে যায়েদ বিন খাত্তাব নামে একটি মিনার ছিল। যায়েদ বিন খাত্তাব ছিলেন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ভাই। তিনি মিথ্যুক নবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। পরবর্তীতে অজ্ঞাত পরিচয়ের লোকেরা তার কবরের ওপর গম্বুজ তৈরী করে। কালক্রমে তা এক দেবতা মন্দিরে পরিণত হয়। এতে বিভিন্ন ধরনের মানত পেশ করা হতো এবং কাবা ঘরের ন্যায় তাওয়াফও করা হতো। সেখানে আরো অনেক কবর ছিল। আশপাশের গাছপালারও ইবাদত হতো।

একদা শাইখ আমীর উছমানকে বললেন, চলুন আমরা যায়েদ বিন খাত্তাবের কবরের ওপর নির্মিত গম্বুজটি ভেঙ্গে ফেলি। কেননা এটি অন্যায়ভাবে এবং বিনা দলীলে নির্মাণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই কাজের প্রতি কখনই সন্তুষ্ট হবেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের ওপর কোন কিছু নির্মাণ করতে এবং কবরকে মসজিদে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন। এই গম্বুজটি মানুষকে গোমরাহ করছে, মানুষের আকীদা পরিবর্তন করছে এবং এর মাধ্যমে নানা রকম শির্ক হচ্ছে। সুতরাং এটি ভেঙ্গে ফেলা আবশ্যক।

আমীর উছমান বললেন, এতে কোন অসুবিধা নেই। অতঃপর উছমান বিন মুআম্মার গম্বুজটি ভাঙ্গার জন্য ৬০০ সৈনিকের একটি বাহিনী নিয়ে বের হলেন। শাইখও তাদের সাথে ছিলেন।

উছমানের বাহিনী যখন জুবাইলিয়ার নিকটবর্তী হলো এবং জুবাইলিয়ার অধিবাসীরা জানতে পারলো যে, যায়েদ বিন খাত্তাবের মিনার ভাঙ্গার জন্য একদল লোক আগমন করেছে তখন তারা গম্বুজটি রক্ষা করার জন্য বের হলো। কিন্তু আমীর উছমান এবং তাঁর সৈনিককে দেখে তারা ফিরে গেল। উছমানের সৈনিকরা গম্বুজটি গুড়িয়ে দিল। শাইখের প্রচেষ্টায় এই মিনারটি ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং তিনি নিজেও ভাঙ্গার কাজে অংশ নেন।

আল-হামদুলিল্লাহ। চিরতরে শির্কের একটি আস্তানা বিলুপ্ত হলো। এমনিভাবে শির্কের আরো অনেক আস্তানা আল্লাহ তাআলা সম্মানিত শাইখের মাধ্যমে বিলুপ্ত করলেন।

ব্যভিচারের শাস্তি কায়েমঃ

উয়ায়নাতে অবস্থানকালে এক মহিলা একদিন তাঁর কাছে এসে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করে বিচার প্রার্থনা করে। মহিলাটির অবস্থা স্বাভাবিক কি না, তা জানার জন্য তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন, মহিলাটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং তার মাথায় কোন পাগলামী নেই, তখন মহিলাটিকে বললেন, সম্ভবতঃ জোর খাটিয়ে তোমার সাথে এই অপকর্ম করা হয়েছে। সুতরাং তোমার বিচার প্রার্থনা করার দরকার নেই। অবশেষে মহিলাটি জোর দাবী জানালে এবং বার বার স্বীকার করতে থাকলে শায়েখের নির্দেশে লোকেরা পাথর মেরে মহিলাটিকে হত্যা করে ফেলে।

উয়ায়নাতে উছমান বিন মুআম্মারের সহযোগিতায় ও সমর্থনে শাইখের সংস্কার আন্দোলন যখন পুরোদমে চলতে থাকে, তখন আহসার শাসক সুলায়মান বিন আব্দুল আযীযের কাছে এই খবর পৌঁছে গেল। শাইখের বিরোধীরা সুলায়মানকে জানিয়ে দিল যে, শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নামে এক ব্যক্তি কবরের ওপর নির্মিত গম্বুজগুলো ভেঙে ফেলছে এবং ব্যভিচারের শাস্তিও কায়েম করছে। আহসার আমীর এতে রাগান্বিত হলো এবং সে উয়ায়নার আমীর উছমানকে এই মর্মে পত্র লিখলো যে, আপনি অবশ্যই এই লোকটিকে হত্যা করবেন। অন্যথায় আমরা আপনাকে ট্যাক্স দেয়া বন্ধ করে দিবো।

উল্লেখ্য যে, আহসার এই গ্রাম্য অশিক্ষিত শাসক উছমানকে বিরাট অংকের টেক্স প্রদান করতো। তাই উছমান পত্রের বিষয়টিকে খুব বড় মনে করলেন এবং এই আশঙ্কা করলেন যে, শাইখের দাওয়াতের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখলে আহসার ট্যাক্স বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের পক্ষ হতে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণারও ভয় রয়েছে।

তাই তিনি শাইখকে পত্রের বিষয় অবগত করলেন এবং বললেন, আহসার শাসকের পত্র মোতাবেক আমরা আপনাকে হত্যা করা সমীচিন মনে করছি না। আপনাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করাও এখন থেকে আর সম্ভব হবে না। কারণ আমরা আহসার শাসক সুলায়মানকে খুব ভয় করছি। আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও সক্ষম নই। সুতরাং আপনি যদি আমাদের কল্যাণ ও আপনার নিজের কল্যাণ চান, তাহলে আমাদের নিকট থেকে চলে যান।

শাইখ তখন বললেন, আমি যেই বিষয়ের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি, তা তো আল্লাহর দীন। এটিই তো কালেমা তাইয়্যেবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' -এর দাবী। যে ব্যক্তি এই দীনকে মজবুতভাবে ধারণ করবে,

একে সাহায্য করবে এবং দৃঢ়তার সাথে এই দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন এবং তাঁর শত্রুদের ওপর তাকে বিজয় দান করবেন। সুতরাং আপনি যদি ধৈর্য ধারণ করেন এবং দীনের ওপর অটল থাকেন এবং এই দাওয়াতের প্রতি সাহায্য ও সমর্থন অব্যাহত রাখেন, তাহলে আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনাকে অচিরেই বিজয় দান করবেন এবং এই গ্রাম্য যালেম শাসক ও তার বাহিনী থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন। সেই সাথে আল্লাহ আপনাকে তার অঞ্চল ও তার গোত্রের শাসনভার আপনার হাতেই সোপর্দ করবেন।

এতে উছমান বললেন, হে সম্মানিত শাইখ! তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই এবং তার বিরোধীতা করার মত ধৈর্যও আমাদের নেই।

দিরিয়ায় হিজরত এবং দিরিয়ার আমীর মুহাম্মাদ বিন সঊদের সাথে সাক্ষাত:

পরিশেষে উছমান বিন মুআম্মারের অনুরোধে বাধ্য হয়ে শাইখ উয়ায়না থেকে বেরিয়ে পড়লেন। উয়ায়না ছেড়ে তিনি দিরিয়ায় হিজরত করলেন। বলা হয়ে থাকে যে, বের হওয়ার সময় শাইখ পায়ে হেঁটে বের হন। কারণ উছমান শাইখের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করেননি। তাই সকাল বেলা বের হয়ে সারাদিন পায়ে হেঁটে বিকাল বেলা দিরিয়ায় গিয়ে পৌঁছেন। দিরিয়ায় পৌঁছে তিনি একজন ভালো মানুষের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার নাম মুহাম্মাদ বিন সুয়াইলিম আল উরায়নী। এই লোকটি শাইখকে একদিকে যেমন আশ্রয় দিলেন, অন্যদিকে আমীর মুহাম্মাদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু শাইখ তাকে এই বলে শান্ত করলেন যে, আমি যেদিকে মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছি, তা হচ্ছে আল্লাহর দীন। অচিরেই আল্লাহ তাআলা এই দীনকে বিজয়ী করবেন। যাই হোক আমীর মুহাম্মাদের কাছে শাইখের খবর পৌঁছে গেল।

ইতিহাসে বলা হয় যে, একদল ভালো লোক প্রথমে আমীরের স্ত্রীর কাছে গিয়ে শাইখের দাওয়াতের বিষয়টি বুঝিয়ে বললেন। আমীরের স্ত্রী ছিলেন একজন ভালো ও দীনদার মহিলা। তারা আমীরের স্ত্রীকে বললেন, আপনার স্বামী মুহাম্মাদকে বলুন, তিনি যেন শাইখের দাওয়াত কবুল করেন এবং তাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।

অতঃপর যখন আমীর মুহাম্মাদ বাড়িতে আসলেন, তখন আমীরের স্ত্রী তাকে বললেন, আপনার অঞ্চলে বিরাট এক গণীমত আগমন করেছে।

আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তাআলা নিজেই আপনার নিকট এই গণীমত পাঠিয়েছেন। আপনার এলাকায় এমন একজন লোক আগমন করেছেন, যিনি আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে আহবান করেন এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের দিকে দাওয়াত দেন। কত সুন্দর এই গণীমত! সুতরাং আপনি দ্রুত তাকে কবুল করে নিন এবং তাকে সাহায্য করুন। খবরদার! আপনি কখনই এ থেকে পিছপা হবেন না।

আমীর মুহাম্মাদ তাঁর স্ত্রীর এই মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি ইতস্ততবোধ করছিলেন এই ভেবে যে তিনি নিজেই শাইখের কাছে যাবেন? না শাইখকে নিজের কাছে ডেকে আনবেন? এবারও তাঁর স্ত্রী তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, শাইখকে আপনার কাছে ডেকে আনা ঠিক হবে না। বরং শাইখ যেখানে অবস্থান করছেন, আপনারই সেখানে যাওয়া উচিৎ। কেননা ইলম এবং দীনের দাঈর সম্মানকে সমুন্নত রাখার স্বার্থেই তা করা বাঞ্চনীয়। আমীর মুহাম্মাদ এবারও তার স্ত্রীর পরামর্শ কবুল করে নিলেন।

আমীর মুহাম্মাদ বিন সঊদ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য মুহাম্মাদ বিন সুওয়াইলিমের বাড়িতে গেলেন। সেখানে গিয়ে শাইখকে সালাম দিলেন এবং তাঁর সাথে আলোচনা করলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, হে শাইখ! আপনি সাহায্যের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, নিরাপত্তার সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং সর্ব প্রকার সহযোগিতারও সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

জবাবে শাইখও আমীরকে আল্লাহর সাহায্য, বিজয়, প্রতিষ্ঠা এবং শুভ পরিণামের সুসংবাদ প্রদান করলেন। শাইখ আরো বললেন, এটি হচ্ছে আল্লাহর দীন। যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনকে সাহায্য করবে, আল্লাহও তাকে সাহায্য করবেন, শক্তিশালী করবেন। অচিরেই আপনি এর ফল দেখতে পাবেন।

অতঃপর আমীর মুহাম্মাদ বললেন, হে শাইখ! আমি আপনার হাতে আল্লাহ ও আল্লাহর দীনের ওপর অটুট থাকার এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার বায়আত করবো। তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমরা যখন আপনাকে সমর্থন করবো, আপনাকে সাহায্য করবো এবং আল্লাহ তাআলা যখন শত্রুদের ওপর আপনাকে বিজয় দান করবেন, তখন আপনি আমাদের দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যান কি না।

শাইখ জবাবে বললেন, এমনটি কখনই হবে না। আপনাদের রক্ত আমারই রক্ত, আপনাদের ধ্বংস আমারই ধ্বংস। আপনার শহর ছেড়ে আমি কখনই অন্যত্র চলে যাবো না।

অতঃপর আমীর মুহাম্মাদ শাইখকে সাহায্য করার বায়আত করলেন এবং শাইখও অঙ্গীকার করলেন যে, তিনি আমীরের দেশেই থাকবেন এবং আমীরের সহযোগী হিসাবেই কাজ করবেন ও আল্লাহর দীনের বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবেন। এভাবেই ঐতিহাসিক বায়আত সম্পন্ন হলো।

শাইখের দাওয়াতের নতুন যুগঃ

এভাবে শাইখের দাওয়াত এক নতুন যুগে প্রবেশ করল। দিরিয়ার আমীরের সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করার অঙ্গীকার পেয়ে শাইখ নতুন গতিতে নির্ভয়ে দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন। প্রত্যেক অঞ্চল থেকে দলে দলে লোকেরা দিরিয়ায় আসতে লাগল। শাইখ সম্মান ও ইজ্জতের সাথে এখানে বসবাস করতে লাগলেন এবং তাফসীর, হাদীস, আকীদা, ফিকহসহ দীনের বিভিন্ন বিষয়ে দারস দানে মশগুল হয়ে পড়লেন। নিয়মিত দারস্ দানের পাশাপশি সমর্থক ও সাথীদেরকে নিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে শির্কের আস্তানা গুড়িয়ে দিতে থাকেন এবং যেসব মাজারে মানত স্বরূপ হাদীয়া-তোহফা পেশ করা হতো তা একের পর এক উচ্ছেদ করতে থাকেন।

শাইখ যখন দিরিয়ায় আসলেন তখন জানতে পারলেন যে, সেখানে এমন একটি পুরুষ খেজুর গাছ রয়েছে, যাকে الفحل ফাহল বা ফাহ্হাল বলা হতো। এই খেজুর গাছের ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল, কোন মহিলার বিয়ে হতে দেরী হলে কিংবা তাকে বিয়ের জন্য কেউ প্রস্তাব না দিলে সে এই খেজুর গাছটিকে জড়িয়ে ধরত এবং বলতো,

يا أفحل الفحول أريد زوجا قبل الحول

হে সকল ষাঁড়ের সেরা ষাঁড়! বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তোমার কাছে একজন স্বামী চাই। তাদের ধারণা ছিল, এভাবে এ গাছকে জড়িয়ে ধরলে অবিবাহিত মহিলাদের দ্রুত বিবাহ সম্পন্ন হতো এবং বিয়ে হয়ে গেলে তারা এ গাছকেই বিয়ে হওয়ার কারণ মনে করতো। তাদের মুর্খতা এতদূর গিয়ে পৌঁছল যে, কোন মহিলা গাছটিকে জড়িয়ে ধরার পর যখন তার বিয়ের প্রস্তাব আসতো, তখন তারা বলতো তোমাকে এই গাছটি সাহায্য করেছে। অতঃপর শাইখের আদেশে গাছটিকে কেটে ফেলা হয়। আল্লাহ তাআলা শির্কের এ মাধ্যমটিকে চিরতরে মিটিয়ে দিলেন।

এভাবেই আল্লাহ তাআলা শাইখের দাওয়াতকে দিরিয়াতে সফলতা দান করলেন। পরবর্তীতে সমগ্র আরব উপদ্বীপ এবং পার্শ্ববর্তী আরব দেশসমূহ এবং সারা বিশ্বে এ দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লো।

আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরকে তাওহীদের জ্ঞান অর্জন ও তা বাস্তবায়নের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। সেই সাথে যেসব বিষয় তাওহীদের বিপরীত এবং যা মানুষের তাওহীদকে নষ্ট করে দেয় সেসব বিষয় সম্পর্কেও শাইখ গভীর পারদর্শিতা অর্জন করেন।

শাইখ তাওহীদের দাওয়াতকে পুনরুর্জ্জীবিত করার জন্য সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মূল বিষয় তথা তাওহীদে উলুহীয়াতের দাওয়াত শুরু করেন এবং শির্ক ও বিদআতের প্রতিবাদ করেন। তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার পাশাপাশি তাঁর একাধিক ইলমী মজলিস ছিল। প্রতিদিন তিনি তাওহীদ, তাফসীর, ফিকাহ এবং অন্যান্য বিষয়ে একাধিক দারস্ প্রদান করতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দাওয়াতের মধ্যে বরকত দান করলেন। ফলে আরব উপদ্বীপের লোকেরা তাঁর দাওয়াত কবুল করে শির্ক, বিদআত ও কুসংস্কারের অন্ধকার পরিহার করে তাওহীদের আলোর দিকে ফিরে আসলো। তাঁর বরকতময় দাওয়াত অল্প সময়ের মধ্যেই আরব উপদ্বীপের সীমা পার হয়ে ইরাক, মিশর, সিরিয়া, মরোক্ক, ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর সকল অঞ্চলেই পৌঁছে যায়। ফলে তিনি ১২শ শতকের মুজাদ্দেদ উপাধিতে ভূষিত হন।

সে সময়ের দিরিয়ার শাসক সম্প্রদায়ও শাইখের দাওয়াতকে কবুল করে নেন এবং সাহায্য করেন। এতে শাইখের দাওয়াত নতুন গতি পেয়ে দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। বর্তমানে সৌদি আরবসহ সারা বিশ্বে তাওহীদের যেই দাওয়াত চলছে, তা শাইখের দাওয়াতের ফল ও হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আল্লাহ যেন এই দাওয়াতকে কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখেন। আমীন।

শাইখের দাওয়াতের মূলনীতি:

পরিশুদ্ধ ইসলামী মানহাজ এবং দীনের সঠিক মূলনীতির ওপর শাইখের দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দাওয়াতের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল, ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে সমস্ত মূলনীতির ভিত্তিতে শাইখের দাওয়াতী কাজ পরিচালিত হতো, নিম্নে তা থেকে কয়েকটি মূলনীতি উল্লেখ করা হলো:

১) মানুষের অন্তরে তাওহীদের শিক্ষা বদ্ধমূল করা এবং শির্ক ও বিদআতের মূলোৎপাটন করা। মুসলিমদের অন্তরে এই মূলনীতিকে সুদৃঢ় করার জন্যই তিনি প্রয়োজন পূরণের আশায় কবর যিয়ারত করা, কবরবাসীর কাছে দুআ করা, কিছু চাওয়া, রোগমুক্তি ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধার লাভের আশায় তাবীজ ঝুলানো, গাছ ও পাথর থেকে বরকত গ্রহণ করা, আল্লাহ্

ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য পশু জবেহ করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য মানত করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে আশ্রয় চাওয়া, কবর পূজা করা, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে উসীলা নির্ধারণ করা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য অলী-আওলীয়ার কাছে শাফাআত চাওয়াসহ যাবতীয় শির্ক বর্জন করার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন।

২) সালাত কায়েম করা, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাসহ দীনের অন্যান্য নিদর্শন এবং আচার-অনুষ্ঠানগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৩) সমাজে ন্যায়বিচার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত দন্ডবিধি কায়েম করা।

৪) তাওহীদ, সুন্নাহ, ঐক্য, সংহতি, সম্ভ্রম রক্ষা, নিরাপত্তা এবং ন্যায় বিচারকে মূলভিত্তি করে একটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

যে সমস্ত অঞ্চলে শাইখের দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আরব উপদ্বীপের যেই এলাকাগুলো এই দাওয়াতের দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়েছে, সেখানে উপরোক্ত মূলনীতিগুলোর সবই বাস্তবায়িত হয়েছে। এই সংস্কার আন্দোলনের পতাকাবাহী সৌদি আরবের প্রতিটি অঞ্চলেই এর প্রভাব সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়েছে। এই দাওয়াত যেখানেই প্রবেশ করেছে, সেখানেই তাওহীদ, ঈমান, সুন্নাত, নিরাপত্তা ও শান্তি প্রবেশ করেছে। ফলে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। যেমন তিনি প্রতিষ্ঠা দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের সেই দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে অন্য

কিছুকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই ফাসেক”। (সূরা আন নূর ২৪:৫৫)

﴿وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝٤٠ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ۝٤١﴾

“যারা আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী শক্তিধর। তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করবে। আর সমস্ত বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্‌র হাতে”। (সূরা আন নূর ২৪:৪০-৪১)

শাইখের বিরোধীতা ও তার ওপর মিথ্যাচারঃ

সত্যের অনুসারী এবং সত্যের পথে যারা আহবান করেন, তারা কোন যুগেই বাতিলপন্থীদের হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পান নি। যেমন রেহাই পাননি আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা নবী-রাসূলগণ। আমাদের সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব রহিমাহুল্লাহ যখন সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন এবং সাহসিকতা ও বলিষ্ঠতার সাথে শির্ক, বিদআত ও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক কুসংস্কারের প্রতিবাদ শুরু করেন, তখন বিদআতী আলেমগণ তাঁর ঘোর বিরোধীতা শুরু করে। তাঁর বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপন করে। এমনকি এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী লোক সমসাময়িক শাসকদের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। তাঁকে একাধিকবার হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করা হয়। কিন্তু বিরোধীদের সকল ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হয়। আল্লাহর ইচ্ছা অতঃপর শাইখের সৎসাহস ও নিরলস কর্ম তৎপরতার মোকাবেলায় বিরোধীদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহর দীন ও তাওহীদের দাওয়াতই বিজয় লাভ করে।

বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতই বাংলাদেশসহ ভারত বর্ষে যে সমস্ত আলেম ও দাঈ সহীহ আকীদা ও আমলের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন, অতীতের ন্যায় তারাও বিরোধীদের নানা রকম অপবাদ ও অভিযোগের সম্মুখীন হচ্ছেন। এই বরকতময় দাওয়াত থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য এক শ্রেণীর লোক সহীহ আকীদার অনুসারীদেরকে ওয়াহাবী এবং নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াতকে ওয়াহাবী আন্দোলন বলে গালি দেয়াসহ নানা অপবাদ দিয়ে যাচ্ছে। এত

কিছুর পরও আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবাণীতে এবং দীনের মুখলিস আলেম ও দাঈদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় বাংলাদেশসহ ভারত বর্ষের প্রত্যেক অঞ্চলেই এ দাওয়াতের প্রভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। আগামী দিনগুলোতে ব্যাপক হারে এই দাওয়াতের সাথে আমাদের দেশের লোকেরা সম্পৃক্ত হবে, আমাদের সামনে এই লক্ষণ অতি সুস্পষ্ট।

শাইখের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ ও তার জবাব:

বিদআতীদের পক্ষ হতে শাইখের বিরুদ্ধে সেসময় অনেকগুলো অভিযোগ পেশ করা হতো। সম্ভবত বর্তমান কালেও তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলো ছাড়া অন্য কোন অভিযোগ খুঁজে পাওয়া যাবে না। শাইখের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো নিম্নরূপ:

১) শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব অলী-আওলীয়াদের কবরে মানত পেশ করা ও কবরকে সম্মান করা এবং কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা বন্ধ করে দিয়েছেন।

২) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে পশু জবেহ করা হারাম করেছেন।

৩) আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া, শাফাআত চাওয়া এবং অলী-আওলীয়াদের উসীলা ধরাকে হারাম করেছেন।

৪) শাইখ নিজ মতের বিরোধীদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং অন্যায়ভাবে তাদেরকে হত্যা করেছেন।

৫) শাইখের বিরুদ্ধে পঞ্চম মাযহাব তৈরীর অভিযোগ করা হয়। এমনি আরো অনেক অভিযোগ শাইখের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়ে থাকে।

আসলে এগুলো কোন অভিযোগের আওতায় পড়ে না। এগুলো এমন বিষয়, যা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দলীল দ্বারাই হারাম করা হয়েছে। তাঁর পূর্বে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং তাঁর ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ এ ধরনের শির্ক-বিদআতের জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে যার সামান্য জ্ঞান রয়েছে সেও বুঝতে সক্ষম হবে যে, উপরোক্ত বিষয়গুলোর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। দীনের সঠিক শিক্ষা না থাকার কারণে, তাওহীদের আলো নিভে যাওয়ার সুযোগে এবং সর্বত্র মুর্খতা ও পাপাচার ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মুসলিম সমাজে উক্ত কুসংস্কার গুলোও ঢুকে পড়েছিল। উক্ত কাজগুলো ইসলামী শরীয়াতের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে এবং তাওহীদের সরাসরি বিরোধী হওয়ার কারণে শাইখ মুসলিমদেরকে সঠিক

দীনের দিকে ফিরে আসার আহবান জানিয়েছেন। এটি শুধু তার একার দায়িত্ব ছিল না; বরং সকল আলেমেরই এই দায়িত্ব ছিল। তাই শাইখের দাওয়াত ছিল সম্পূর্ণ তাওহীদ ও সুন্নাহ ভিত্তিক। এটি ছিল একটি সংস্কার আন্দোলন।

তাঁর বিরুদ্ধে ওয়াহাবী মাযহাব নামে পঞ্চম মাযহাব তৈরীর অভিযোগও পেশ করা হয়ে থাকে। এ অভিযোগটিও ভিত্তিহীন। শাইখ কোন মাযহাব তৈরী করেননি; বরং মুসলিমদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে আহবান জানিয়েছেন। তা ছাড়া তাঁর কিতাবাদি পড়লে বুঝা যায় দীনের শাখা ও ফিকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাবের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। তবে তিনি মাযহাবী গোঁড়ামির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে ছিলেন।

শাইখের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ করা হয় যে, তিনি বিরোধীদেরকে হত্যা করেছেন। এই অভিযোগটিও সঠিক নয়। কারণ যারা তার বিরুদ্ধে তথা তাওহীদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে, তিনি কেবল তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করেছেন। তাঁর জিহাদ ছিল শরঈ জিহাদ। সুতরাং যারা সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে নিহত হয়েছে, তাদেরকে তিনি অন্যায়ভাবে হত্যা করেছেন, এই অভিযোগ সঠিক নয়।

অনেকে তাকে হাদীসে বর্ণিত 'নাজদ'এর ফিতনা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের শাম এবং ইয়ামানে বরকত দান করো। সকলেই তখন বলল, আর আমাদের নাজদে? তিনি বললেন, ওখান থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের ভাষ্য জগতের বিরল প্রতিভা হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানীসহ অন্যান্য আলেমগণ বলেন, হাদীসে উল্লেখিত নাজদ হল ইরাকের নাজদ শহর। আর ইরাকেই বড় বড় ফিতনা দেখা দিয়েছে। আলী এবং হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইরাক শান্ত হয়নি। সেখানকার ফিতনার কারণেই আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কুফায় এবং হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন। হেজাযের নাজদে কোন ফিতনাই দেখা যায়নি। যেমনটি ইরাকে দেখা দিয়েছে। সুতরাং হেজাযের নাজদ থেকে শাইখের যেই তাওহীদি দাওয়াত প্রকাশিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, তা ছিল নাবী-রাসূলদেরই দাওয়াত। সুতরাং সুস্পষ্ট বিদআতী আর অন্ধ ছাড়া কেউ এই দাওয়াতকে নাজদের ফিতনা বলতে পারে না।

শাইখের দাওয়াতের ফলাফল:

শাইখের বরকতময় দাওয়াতের ফলে আরব উপদ্বীপসহ পৃথিবীর বহু অঞ্চল থেকে শির্ক-বিদআত ও দীনের নামে নানা কুসংস্কার উচ্ছেদ হয়। যেখানেই এই দাওয়াত প্রবেশ করেছে, সেখানেই তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হকপন্থীগণ সম্মানিত হয়েছেন। হাজীগণ সারা বিশ্ব হতে মক্কা ও মদীনায় আগমন করে শাইখের দাওয়াত পেয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করতে থাকেন। বাদশাহ আব্দুল আযীযের যুগে সুবিশাল সৌদি আরব তাওহীদের এ দাওয়াতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ এই দাওয়াতের ফল ভোগ করছেন সৌদি রাজ পরিবার ও তার জনগণসহ মুসলিম বিশ্বের বহু সংখ্যক জ্ঞানী-গুণী ও বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ। বিশ্বের যেখানেই কুরআন, সুন্নাহ এবং সহীহ আকীদার দাওয়াত ও শির্ক-বিদআতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে, তা শাইখের এই বরকতময় দাওয়াতেরই ফসল। হে আল্লাহ! তুমি কিয়ামত পর্যন্ত তাওহীদের এই দাওয়াতকে সমুন্নত রাখো। আমীন।

শাইখের ছাত্রগণ:

তাঁর নিকট থেকে অগণিত লোক তাওহীদ ও দীনের অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন। **তাদের মধ্যে:**

১) শাইখের চার ছেলে হাসান, আব্দুল্লাহ্, আলী এবং ইবরাহীম। তাদের প্রত্যেকেই ইসলামী শরীয়াতের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

২) তাঁর নাতী শাইখ আব্দুর রাহমান বিন হাসান।

৩) শাইখ আহমাদ বিন নাসের বিন উছমান এবং আরো অনেকেই।

শাইখের ইলমী খেদমত:

শাইখের রয়েছে ছোট বড় অনেকগুলো সুপ্রসিদ্ধ কিতাব। তার মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও আলোচিত হচ্ছে এই কিতাবুত্ তাওহীদ। শাইখের আরো যেসমস্ত গ্রন্থ রয়েছে, তার মধ্যে:

(১) কাশফুস শুবুহাত।

(২) আল উসূলুস সালাসাহ ওয়া আদিল্লাতুহা।

(৩) উসূলুল ঈমান।

(৪) তাফসীরুল ফাতিহা।

(৫) মাসায়িলুল জাহেলিয়্যাহ।

(৬) মুখতাসার যাদুল মাআদ

(৭) মুখতাসার সিরাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রভৃতি।

শাইখের মৃত্যুঃ

হিজরী **১২০৬** সালের যুল-কাদ মাসের শেষ তারিখে **৯১** বছর বয়সে শাইখ দিরিয়ায় মৃত্যু বরণ করেন। হে আল্লাহ! তুমি শাইখকে তোমার প্রশস্ত রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করে নাও। আমাদেরসহ তাঁকে নবী, সিদ্দীকীন, শহীদ এবং সালেহীনদের সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দাও। আমীন

পুস্তিকাটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

লেখক এই পুস্তিকাটির নাম দিয়েছেন, "তিনটি মূলনীতি"। এটি একটি সহজ-সরল সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। শাইখ তাঁর ছাত্রগণ এবং সাধারণ জনগণকে গুরুত্ব সহকারে পুস্তিকাটি পাঠ দান করতেন। মসজিদে উপস্থিত মুসল্লীদেরকেও তিনি এটা পড়াতেন। মসজিদের ইমামগণকে এ মর্মে বাধ্য করা হতো যে, তারা যেন মসজিদের মুসল্লীদেরকে এ পুস্তিকাটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন, তারা এটি পাঠ করেছে কি না। আলেমগণ বিভিন্ন শহর ও গ্রামের লোকদেরকে এটা পড়ানোর জন্য বের হতেন। কেননা এটি সংক্ষিপ্ত হলেও এতে দীনের ঐসব মূলনীতিসমূহ আলোচনা করা হয়েছে, যা প্রত্যেক মানুষের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সমসাময়িক আলেমগণ এ পুস্তিকাটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন।

(১) কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন এবং এর ওপর টিকা লাগিয়েছেন। এর ব্যাখ্যাগুলো গণনা করে শেষ করা যাবে না। যেসব ব্যাখ্যা ছাপা হয়েছে, তার মধ্যে ইবনে কাসেম প্রণীত হাশীয়াতু সালাসাতিল উসূল, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন প্রণীত শরহু সালাসাতিল উসূল, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন ফাওযান প্রণীত হুসূলুল মামুল শরহু সালাসাতিল উসূল অন্যতম।

(২) কেউ কেউ ছাত্রদেরকে এটি মুখস্ত করানোর ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ছাত্রদেরকে পাঠ দান করার ক্ষেত্রে আলেমদের এটি একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তারা ছাত্রদেরকে ছোট ছোট পুস্তকগুলোর মূল বাক্যগুলো মুখস্ত করিয়ে থাকেন। বিশেষ করে আকীদার পুস্তিকাগুলোর প্রতি তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম তাঁর ছাত্রদেরকে সর্বপ্রথম এ পুস্তিকাটি মুখস্ত করাতেন।

(৩) আলেমগণ সাধারণ মুসলিমদেরকেও এটি মুখস্ত করাতেন। যেমন ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

(৪) কেউ কেউ পুস্তিকাটিকে ছন্দ আকারে পরিণত করেছেন। যারা এটিকে ছন্দে পরিণত করেছেন, তাদের মধ্যে (ক) শাইখ উমার বিন ইবরাহীম আল-বাররী আল-মাদানী (মৃত. ১৩৭৮ হি.)। তিনি তার ছন্দের নাম দিয়েছেন তাসহীলুল হিফয্ ওয়াল উসূল নাযমু সালাসাতিল উসূল। (খ) শাইখ সাউদ আল-শুরাইম এটিকে ছন্দে রূপ দান করে নাম রেখেছেন, ইসরাজুল খুয়ূল নাযমু সালাসাতিল উসূল।

(৫) কেউ কেউ এটিকে আরো মুখতাসার (সংক্ষিপ্ত) করেছেন। যারা এটিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, তাদের মধ্যে শাইখ আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আল-শাতারী আল-মাদানী (মৃত. ১৩৮৭ হি.) অন্যতম। শাইখ আব্দুল আযীযের নাতি সা'দ আল-শাতারী 'মাসকুলু ফিত্ তা'লীক আলা মুখতাসারি সালাসাতিল উসূল' নামে পুস্তিকাটির যে টিকা লিখেছেন তার সাথে উক্ত মুখতাসারটিও ছাপানো হয়েছে।

পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু

তাওহীদুল উলুহীয়াহ বাস্তবায়ন এবং প্রত্যেক মানুষকে কবরে যে তিনটি প্রশ্ন করা হবে, তার জবাব সম্পর্কেই পুস্তিকাটি রচনা করা হয়েছে। এ পুস্তিকাটিতে মূলত চারটি বিষয় স্থান পেয়েছে।

প্রথম বিষয়ঃ এখানে লেখক চারটি মাসআলা আলোচনা করেছেন। তা হলো

(১) ইলম (২) আমল (৩) দাওয়াত ও (৪) সবর।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ এখানে লেখক তাওহীদুল উলুহীয়াত বাস্তবায়নের তিনটি মূলনীতি আলোচনা করেছেন।

তৃতীয় বিষয়ঃ এখানে লেখক মাত্র একটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদ-দীনুল হানীফ তথা একনিষ্ঠ দীন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

চতুর্থ বিষয়ঃ এখানে লেখক তিনটি মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

(১) বান্দা তার রব সম্পর্কে জানবে

(২) তার নবী সম্পর্কে জানবে ও

(৩) তার দীন সম্পর্কে জানবে। এ তিনটি মূলনীতির প্রত্যেকটি দলীলসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

الأصول الثلاثة

তিনটি মূলনীতি

আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা এখন তিনটি মূলনীতি নামক পুস্তিকাটির ব্যাখ্যা শুরু করতে যাচ্ছি। লেখক পুস্তিকাটির নামকরণ করেছেন الاصول الثلاثة (তিনটি মূলনীতি) নামে।

الأصول **শব্দটি** فَعْلٌ এর ওজনে الأصل এর বহুবচন। فَعْلٌ এর বহুবচন যেমন فُعُول হয় তেমনি أَصْلٌ এর বহুবচন হয় أصول।

الأصل শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, যার ওপর অন্য কিছুর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। যেমন বলা হয় أصل الجدار অর্থাৎ প্রাচীরের মূল ভিত্তি। মূলভিত্তি ছাড়া শাখা-প্রশাখা অস্তিত্বশীল হয় না। সুতরাং প্রত্যেক শাখারই মূল থাকা আবশ্যক। যা থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয় এবং ছড়িয়ে পড়ে।

এখানে 'উসূলুস সালাসাহ' দ্বারা দীনের সেই মূলনীতিগুলো উদ্দেশ্য, যার ওপর দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। এ মূলনীতিগুলো সম্পর্কেই প্রত্যেক বান্দাকে কবরে প্রশ্ন করা হবে।

সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রহিমাহুল্লাহ বলেন,

بسم الله الرحمن الرحيم

اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। হে পাঠক! আপনি জেনে নিন, আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর রহম করুন! আমাদের সকলের ওপর চারটি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা জরুরী।

....

সহজ ব্যাখ্যা:

এই বাক্যটির দ্বারা লেখক তাঁর পুস্তিকাটি রচনা শুরু করেছেন। এতে রয়েছে তিনটি বিষয়

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' সম্পর্কে। লেখক অন্যান্য আলেমদের অভ্যাস মোতাবেক শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম লিখেছেন। এর একাধিক কারণ রয়েছে।

১) আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ: লেখক তাঁর পুস্তিকাতে আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করেছেন। কেননা আল্লাহর কিতাব কুরআনুল কারীমের শুরুতেই রয়েছে,

﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝١ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। সূরা আল ফাতিহা **১:১-২**।

(২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলগত সুন্নাতের অনুসরণ: লেখক এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করেছেন। কেননা তিনি যখন বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর কাছে চিঠি লিখতেন, তখন সর্বপ্রথম বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম লিখতেন। তিনি রোমের বাদশাহর কাছে পত্র লিখার সময় এভাবে লিখেছেন,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি এই চিঠি।[১]

(৩) পূর্বেকার আলেম ও লেখকদের অনুসরণ: হাফেয ইমাম ইবনে হাজার আসকালনী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যেসব আলেম লেখনির মাধ্যমে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, তাদের অভ্যাস হিসেবে স্থির হয়েছে যে, তারা বড় বড় ইলমী কিতাবগুলো বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম দ্বারা লিখা শুরু করেছন। অনুরূপ ছোট ছোট কিতাবগুলোর শুরুতেও তারা বিসমিল্লাহ লিখে থাকেন।[২] তবে বিসমিল্লাহ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস, যেখানে তিনি বলেছেন,

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بـ {بسم الله الرحمن الرحيم} أقطع

---

[১] সহীহ বুখারী হা/৭, সহীহ মুসলিম হা/১৭৭৩।

[২] ফাতহুল বারী **১/৯**

"প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ যেই কাজ বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম দ্বারা লিখা করা হয় না, তা বরকতশূণ্য, এই হাদীসের সনদ দুর্বল।[৩]

দ্বিতীয় বিষয়: সম্মানিত শাইখ বলেন, আপনি জেনে নিন, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন": এখানে শাইখ ছাত্রের জন্য সর্বপ্রথম রহমতের দুআ করেছেন। ছাত্রের প্রতি এতে তাঁর কোমলতা ও উদারতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আলেমদের স্বভাব এরকমই হওয়া উচিত। তারা ছাত্রদের প্রতি কোমল ও উদার হবেন এবং তাদের জন্য দুআ করবে ও নরম বাক্য ব্যবহার করবেন। এতে করে তাদের কথা লোকেরা সহজেই কবুল করবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দাওয়াত দেওয়ার সময় কোমল ও উদার হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। দীনের দাঈ ও আলেমগণ এ ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

"আল্লাহ্‌র রহমতেই তুমি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছো। পক্ষান্তরে তুমি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতে, তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো"। (সূরা আলে ইমরান ৩:১৫৯)

তৃতীয় বিষয়: আমাদের সকলের ওপর চারটি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা জরুরী: দীনের বিষয়গুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে এটাই লেখকের তরীকা। প্রথমে তিনি বিষয়গুলোর সংখ্যা সীমাবদ্ধ করেন। তিনি বলে থাকেন, এখানে তিনটি বিষয় রয়েছে, চারটি মাসআলা রয়েছে। শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে এটা সর্বোত্তম পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে শ্রোতাদের মন-মস্তিস্কে তা অধিকতর সুবিন্যস্ত ও স্থায়ী হয়।

লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যে বিষয়গুলো অচিরেই উল্লেখ করবেন, তা শিক্ষা করা ওয়াজিব। এগুলো শিক্ষা করা ব্যতীত কারো দীন পরিপূর্ণ হবে না। এগুলো বাস্তবায়ন করা ব্যতীত কারো দীনের জ্ঞানও অর্জিত হবে না। অতঃপর লেখক বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছেন।

---

[৩] আলবানী রহিমাহুল্লাহ যঈফ বলেছেন। যঈফ আল জামে হা/৪২১৭।

প্রথম বিষয়: ইলম (العلم) অর্জন করা

অতঃপর সম্মানিত শাইখ লেখক বলেন,

(الأُولَى) الْعِلْمُ وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.

প্রথম বিষয় হচ্ছে ইলম অর্জন করা। ইলম হচ্ছে, আল্লাহ সম্পর্কে জানা, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জানা এবং দীন ইসলাম সম্পর্কে দলীল-প্রমাণসহ জানা।

....

সহজ ব্যাখ্যা:

প্রথম যে বিষয়টি মানুষের ওপর আবশ্যক, তা হচ্ছে ইলম অর্জন করা। আমরা এ বিষয়টি পাঁচটি মাসআলায় আলোচনা করবো।

(১) **ইলমের সংজ্ঞা:** হক ও হিদায়াত সম্পর্কে দলীল-প্রমাণসহ জানার নামই হচ্ছে ইলম। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, দলীল সহকারে হিদায়াত সম্পর্কে জানাই হচ্ছে ইলম। এটা এবং তাকলীদ কখনো সমান হতে পারে না। ইলম শব্দটি যখন সাধারণভাবে ব্যবহার করা হবে, তখন তা দ্বারা ইসলামী শরীয়াতের ইলম বুঝানো হবে। জেনে রাখা আবশ্যক যে, মানুষের ওপর সর্বপ্রথম তার দীনের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জানা জরুরী। অতএব মুসলিমদের ওপর আবশ্যক যে, তারা তাদের মহান প্রতিপালকের ইবাদত করার জ্ঞান ভালোভাবে অর্জন করবে। কারো ইসলাম ও ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহর তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। যাতে সে শির্কমুক্ত ইবাদত করতে পারে। অতঃপর সে শরীয়াত ও অন্যান্য ওয়াজিব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করবে।

(২) **সর্বপ্রথম তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা জরুরী:** আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, প্রাপ্ত বয়স্কদের ওপর সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার তাওহীদ সম্পর্কে জানা আবশ্যক। আর এটা لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله এর অর্থ জানা ও বুঝার মাধ্যমেই পরিপূর্ণ হবে। কতিপয় আলেম উল্লেখ করেছেন যে, আকীদার ক্ষেত্রে কারো তাকলীদ করা বৈধ নয়। কারো জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে বলবে, আমি অমুকের ন্যায় আকীদা পোষণ করি। বরং তার ওপর জানা আবশ্যক যে, সে তার দীনের ক্ষেত্রে কী আকীদা পোষণ করে।

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে মূর্খলোকদের জন্য আকীদার ক্ষেত্রেও তাকলীদ করা বৈধ। চার ইমাম থেকে এমতটি বর্ণনা করা হয়েছে। শাইখুল

ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া এমতটি অধিকাংশ ইমামের প্রতি সম্বন্ধ করেছেন। শাইখুল ইসলাম বলেন, দীনের মৌলিক বিষয়গুলোতে আমাদের সাথীদের ও অন্যদের মধ্য থেকে অনেক ফিকাহবিদ ও কালামবিদের মতে প্রত্যেকের ওপরই চিন্তা-গবেষণা ও দলীল অনুসন্ধান করা জরুরী। কিন্তু উম্মতের অধিকাংশ আলেম এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। তাদের মতে দলীল-প্রমাণ অনুসন্ধান করা কেবল ইলম অর্জনে সক্ষম ব্যক্তিদের ওপর ওয়াজিব। দীনের মৌলিক ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অনেক মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অতএব, কীভাবে তাদেরকে এ দীনের মৌলিক ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর জ্ঞান অর্জন করতে বাধ্য করা হবে?[৪]

এই শেষোক্ত মতটিই সত্যের অধিক নিকটবর্তী। অজ্ঞ লোকদের জন্য আকীদার মাসআলায় তাকলীদ করা জায়েয। তারা চিন্তা-গবেষণা করা ও দলীল-অনুসন্ধান করতে ও বুঝতে পারে না। তাদের জন্য দীনের শাখা মাসআলা, হুকুম-আহকাম ও আকীদা সব ক্ষেত্রেই তাকলীদ করা বৈধ। এতে কোনো পার্থক্য নেই। সাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণ করতেন। তাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য সম্বলিত বাক্য দু'টি পাঠ করাতেন। এতে চিন্তাগবেষণা করা ও এর দলীল-প্রমাণ অনুসন্ধান করার আদেশ বা অবকাশ দিতেন না। আর যারা দলীল বুঝতে ও অনুসন্ধান করতে সক্ষম তাদের জন্য দীনের শাখা মাসআলা কিংবা আকীদার মাসআলা, এগুলোর কোনোটাতেই তাকলীদ করা বৈধ নয়।

(৩) **ইলমের প্রকারভেদঃ** ইলম দুই প্রকার।

ক. প্রথম প্রকার ইলম অর্জন করা ফরযে কিফায়া।

খ. দ্বিতীয় প্রকার ইলম অর্জন করা ফরযে আইন।

যে প্রকার ইলম অর্জন করা ফরযে কিফায়া, তা হচ্ছে দীনের সহায়ক ইলম; মৌলিক ইলম নয়। যেমনঃ ইলমুল ফারায়েয, ভাষাজ্ঞান, ইলমুল মুসতালাহ বা ইলমুল হাদীসের মূলনীতি সংক্রান্ত জ্ঞান, উসূলুল ফিকহ বা ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি সংক্রান্ত জ্ঞান এবং ফিকহের কিছু মূলনীতি সংক্রান্ত ইলম। এগুলো সম্পর্কে জানা সকল শ্রেণির মানুষের প্রয়োজন পড়ে না।

আবার ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ-শাদি, বিচার-ফায়সালা ও তালাক সংক্রান্ত মাসআলা। এ ধরনের অনেক মাসআলার প্রতি সবার প্রয়োজন পড়ে না।

---

[৪] মাজমুউল ফাতাওয়া, ইমাম ইবনে তাইমিয়া ২০/২০২।

এগুলো শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া। এগুলো সম্পর্কে কিছু লোক ইলম অর্জন করলে অন্যদের ওপর থেকে ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রকার ইলম অর্জন করা ফরযে আইন এবং যেটি উম্মতের প্রত্যেক মানুষের ওপর অর্জন করা ফরয, তা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত।

(ক) ইলমুল আকীদা: প্রত্যেকের ওপর জানা আবশ্যক যে, কীভাবে সে আল্লাহর তাওহীদ বাস্তবায়ন করবে, আল্লাহর তাওহীদ বাস্তবায়নের তরীকা বা পদ্ধতি কী, এ সম্পর্কে জানা সবার ওপর ফরয। অনুরূপ তাওহীদের বিপরীত বিষয় জানাও ফরযে আইন। আর সেটা হচ্ছে শির্ক। শির্ক সম্পর্কে জানা আবশ্যক এই জন্য যে, যাতে সে শির্কে লিপ্ত না হয়ে যায়।

(খ) ইলমুল ইবাদাহ: প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের যেসব ইবাদত করা ফরয, তার মধ্যে ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মানুষের ওপর ফরযে আইন। যেমন সালাত, পবিত্রতা অর্জন, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কে ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর ওপর ফরযে আইন। এগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা কারো জন্য বৈধ নয়। কেননা এগুলো সম্পর্কে ইলম না থাকলে আল্লাহর ইবাদত করা সম্ভব নয়।

(৪) তিনটি বিষয়ের ইলম অর্জন করা জরুরী: লেখক উল্লেখ করেছেন যে, তিনটি বিষয়ে ইলম অর্জন করা জরুরী।

(ক) আল্লাহ সম্পর্কে ইলম অর্জন করা জরুরী। বান্দা আল্লাহর উলুহীয়াত তথা ইবাদত সম্পর্কে জানবে, তাঁর রুবুবীয়াত এবং নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে জানবে।

(খ) আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জানবে। কেননা রিসালাত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তিনিই হলেন আমাদের ও আল্লাহর মাঝে মাধ্যম স্বরূপ।

(গ) দলীল সহকারে দীন ইসলাম সম্পর্কে জানা জরুরী। তিনটি মূলনীতির বর্ণনা করার করার সময় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশা-আল্লাহ।

(৫) হে প্রিয় শিক্ষার্থী, আপনি জেনে নিন যে, আপনার জীবনে যে সময়টুকু ইলম অর্জনের পিছনে কাটাবেন, সেটুকুই হবে আপনার জীবনের সর্বোত্তম সময়। কারণ ইলমের মাধ্যমে বান্দা জেনে-বুঝে তাঁর প্রভুর ইবাদত করতে পারে। এর মাধ্যমেই সে তার মধ্যে জাগ্রত সন্দেহগুলো দূর করতে পারে। এর মাধ্যমেই মানুষ ভুল পরিহার করে সঠিক পথে চলতে পারে এবং বিভ্রান্তি থেকে পরিত্রাণ পেয়ে হিদায়াতের পথে চলতে পারে। ইলম অর্জন

করা আল্লাহর ইবাদত। ইলম মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইলমের পথ হচ্ছে জান্নাতের পথ। ইলমের মর্যাদা হিসেবে এটাই যথেষ্ঠ।

ইমাম যুহরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইলম অর্জনের মত আর কোনো ইবাদত নেই।[৫] ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষকে ইলম শিখানোর চেয়ে অধিক উত্তম আর কোনো ইবাদত নেই।[৬] ইসহাক বিন ইবরাহীম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, গুফরার মাওলা উমার আমাকে বলেছে, হে ইসহাক! তুমি ইলম অর্জন করো। কেননা ইলমের প্রত্যেকটি কথাই তোমাকে হিদায়াতের পথ দেখাবে আর না হয় গোমরাহীর পথ থেকে নিষেধ করবে।[৭]

ইমাম হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইলম অর্জন করার পর বান্দা তার প্রভুর ইবাদত করবে। এটা তার জন্য দুনিয়ার সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সব জিনিস থেকে উত্তম। অর্থাৎ দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত জিনিস দুনিয়াতে সৃষ্টি হবে, এসব অর্জন করা এবং তা আখেরাতের জন্য খরচ করার চেয়ে ইলম অর্জন করা আরো বেশি কল্যাণকর।[৮]

মুহাম্মাদ বিন রাবী আল-মুসেলী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষ বাহ্যিকভাবে সবাই সমান, কারণ তাদের পিতা হলেন আদম এবং মাতা হলেন হাওয়া। মূলত তাদের অহংকার করার মতো কোনো মর্যাদা থাকলে সেটি হচ্ছে মাটি ও পানি। আলেমগণ ছাড়া কারো কোনো মর্যাদা নেই। কেননা তারা সঠিক পথের সন্ধানীদের জন্য পথপ্রদর্শক। আর যা কিছু মানুষকে সুন্দর করে, তাই মূল্যায়নযোগ্য। আর অজ্ঞরা আলেমদের শত্রু।[৯]

অতএব হে বন্ধু! তুমি ইলম অর্জনে আগ্রহী হও। বিশেষ করে যখন তুমি অবসর পাবে এবং যখন তোমার অন্তর পরিষ্কার থাকবে। মনে রেখো, অজ্ঞতা হচ্ছে নিকৃষ্টতম স্বভাব। অনেক মানুষ আছে, যারা এমন বিষয়ে অজ্ঞ থাকার কারণে দোষী হয়, যা শিশুরাও জানে।

---

[৫] আল-বায়হাকী ফিশ-শুআব, ৬/৩৮০,

[৬] আল-জামেউ লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদবিস সামি, ১/৩১১।

[৭] পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র, ১/২২৬।

[৮] রাওযাতুল উকালা, পৃষ্ঠা নং ৪০।

[৯] আসরারুল বালাগা, পৃষ্ঠা নং ২৬৫।

মূর্খতাই মূর্খদের মর্যাদা কমায় আর জ্ঞানীরা জ্ঞানের কারণেই সমাজে মর্যাদা পায়। জ্ঞানী লোক বয়সে ছোট হলেও সমাজে সবচেয়ে বড় বলে বিবেচিত হয় এবং তার কথা ও প্রজ্ঞাই তাদের মধ্যে কার্যকর হয়।[১০]

সালাফগণ আলেমদের সাথে বসতে পেরে আনন্দিত হতেন এবং আলেমদের মজলিসে বসতে আগ্রহী হতেন। মাইমুন বিন মিহরান বলেন, আমার অন্তরে রয়েছে আলেমদের প্রতি বিরাট স্থান, কোনো শহরে তাদেরকে খুঁজে না পেলে তারাই আমার হারানো সম্পদ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। আলেমদের মজলিসেই আমার অন্তরের সংশোধন হয়। তিনি আরো বলেন, মানব সমাজে আলেমের গুরুত্ব সে রকমই যেমন তাতে মিঠা পানির ঝর্ণার গুরুত্ব।[১১] হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আলেমদের মজলিস ব্যতীত সারা দুনিয়া অন্ধকার তুল্য।[১২]

সালাফগণ আলেমদের মর্যাদায় যা কিছু উল্লেখ করেছেন তাতে তারা আমলহীন আলেম উদ্দেশ্য করেননি। তাদের উদ্দেশ্য ঐসব আলেম, যারা তাদের ইলম অনুযায়ী আমল করেন।

দ্বিতীয় বিষয়: ইলম অনুযায়ী আমল করা (العمل به)

প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর ওপর দ্বিতীয় যে মাসআলা সম্বন্ধে জানা আবশ্যক, তা হচ্ছে ইলম অনুযায়ী আমল করা। একজন মানুষ যখন ইলম অর্জন করবে তখন তার ওপর অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করা জরুরী। ইলম অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমেই ইলমের ফলাফল অর্জিত হয়। আমলবিহীন ইলম মানুষের জন্য উপকারী নয়। ইলম অনুযায়ী আমল না করা বিরাট বড় মুসীবত। কেননা আলেম জাহেলের মত নয়। আলেমের সামনে দলীল-প্রমাণ সুস্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত। কবি বলেন, যে আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করে না, তাকে পূর্তিপূজকদের পূর্বেই শাস্তি দেয়া হবে।

কেননা মানুষ ইলম অর্জন করবে ও সত্য সম্পর্কে জানবে, তখন যদি সে তার ইলম অনুযায়ী আমল না করে, তাহলে তার দু'টি অবস্থার যে কোনো অবস্থা হতে পারে। হতে পারে সে ইলম অর্জন করেছে শুধু মানুষের প্রশংসা

---

[১০] নাসরু তাইয়িত তারী, পৃষ্ঠা নং ১৮১।

[১১] জামেউ বায়নিল ইলম ওয়া ফাযলিহি, ১/২২১।

[১২] পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র ১/২৩৬।

অর্জন করার জন্য। এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থা। আমরা এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

কিয়ামতের দিন যাদের মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন জ্বালানো হবে, তাদের সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ

অতঃপর এমন একজন মানুষকে নিয়ে আসা হবে, যে ইলম অর্জন করেছিল এবং তা শিখিয়েছিল ও কুরআন পড়েছিল। তাকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে তাঁর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে তা স্মরণ করবে। আল্লাহ বলবেন, তুমি দুনিয়াতে কী আমল করেছো? সে বলবে, আমি ইলম শিখেছি এবং মানুষকে তা শিখিয়েছি। আর আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি ইলম শিখেছো, যাতে তোমাকে আলেম বলা হয়। কুরআন পড়েছো, যাতে তোমাকে কারী বলা হয়। তোমাকে অবশ্যই আলেম ও কারী বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে আদেশ করা হলে তাকে মুখের ওপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১৩]

হতে পারে সে ইলম শিখেছে, কিন্তু আমল করেনি, কিন্তু সে মানুষকে দেখানোর জন্য ইলম শিখেনি। সে কেবল অলসতা ও বিমুখ হওয়ার কারণে আমল করেনি। এটা একটা বিরাট বড় মুসীবত। কেননা সে জাহেল নয়। সে শিক্ষা গ্রহণ করেছে ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করেছে এবং দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সত্য জেনেছে। তার ওপর দলীল-প্রমাণ ও হুজ্জত কায়েম হয়ে গেছে।

হে ইলম অর্জনকারী! আপনি ঐসব আলেমের মতো হবেন না, যারা ইলম বহন করে অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়, কিন্তু নিজে তা দ্বারা উপকৃত হয় না। হে ইলম অর্জনকারী! আপনি যদি ইলমের বরকত চান, ইলমের বৃদ্ধি চান এবং তার ফলাফল বাস্তবায়ন করতে চান, তাহলে আপনি যেসব

---

[১৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৯০৫।

ওয়াজিব, ফরয ও সুন্নাত সম্পর্কে জেনেছেন, সে অনুযায়ী আমল করুন। আপনি যখন সালাতের হুকুম-আহকাম শিখবেন, তখন তা বাস্তবয়ান করবেন। যখন আপনি সুন্নাত কিংবা ওয়াজিব বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন, তখন সে অনুযায়ী আমল করবেন। যঈফ সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে, আল্লাহ তাকে এমন ইলম দান করবেন, যা তার জানা ছিল না।[১৪] ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বলেছেন, আমরা আমল করার মাধ্যমে হাদীস মুখস্ত করার শক্তি সঞ্চয় করতাম।[১৫]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইলম হচ্ছে আমলের মূল ভিত্তি। সঠিক মূল ভিত্তি সঠিক আমল আবশ্যক করে।

জেনে রাখুন যে, তালিবুল ইলমের ইবাদত অন্যদের চেয়ে বেশি হওয়া আবশ্যক। কেননা তার নিকট রয়েছে এমন ইলম, যা তাকে তার প্রভুর পথ দেখায়। ইলম হচ্ছে একটি বিরাট নিয়ামত। আর আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যক। এটা ইবাদত করার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাকে এমন এক লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, প্রচুর পরিমাণ হাদীস লিখে। জবাবে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বললেন, তার ওপর আবশ্যক হচ্ছে সে তার ইলমের আধিক্য অনুযায়ী বেশি পরিমাণ আমল করবে। তিনি আরো বলেন, নিশ্চয়ই ইলম সম্পদের ন্যায়। সম্পদ বাড়লে যেমন যাকাত বৃদ্ধি পায় তেমনই ইলম বাড়লে সে অনুযায়ী আমলও বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যক।[১৬]

শাইখের এই কথা অত্যন্ত মূল্যবান। এটা নিয়ে তালিবুল ইলমের গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করা আবশ্যক। সেই সঙ্গে তাঁর প্রতিপালকের সাথে তার সম্পর্কটা কেমন, তা নিয়েও গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।

---

[১৪] ফাইযুল কাদীর, ৪/৫১০-৫১১।

[১৫] আল-জামেউ লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদবিস সামি, ২/২৫৯।

[১৬] মাজমু ফাতাওয়া, ৪/৫৩।

তৃতীয় বিষয়: ইলম অনুযায়ী আমলের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেওয়া (الدعوة إليه)

তৃতীয় যে বিষয়টি সবার ওপর শিক্ষা করা ফরয, তা হচ্ছে মানুষ যা শিখবে, তার প্রতি অন্যকে দাওয়াত দিবে। অর্থাৎ কেউ যখন সত্যকে জানবে এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে শিখবে, অতঃপর সেই অনুযায়ী আমল করবে, তখন তার ওপর আরেকটি বিষয় আবশ্যক হয়ে যাবে। তা হচ্ছে সে যে ইলম অর্জন করতে পেরেছে এবং যে কল্যাণ সে লাভ করেছেন, অন্যান্য মানুষকে এর প্রতি আহব্বান জানাবে। কারণ ইলম হচ্ছে কল্যাণকর জিনিস এবং এটা আলো স্বরূপ। অতএব এটাকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা ও অন্যকে তা থেকে মাহরূম করা ঠিক নয়। কেননা দাওয়াত ও আহব্বানের মাধ্যমেই আপনি ইলম অর্জন করেছেন। আমরা যে ইলম পেয়েছি, তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাঁর সাহাবীগণ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন বলেই অর্জন করতে পেরেছি। সাহাবীগণ থেকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তাবেঈগণ। অতঃপর তাবেঈগণ থেকে তাদের পরবর্তীগণ শিখেছেন। এভাবেই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাই আল্লাহ যেহেতু আমাদেরকে ইলম অর্জন করার তাওফীক দিয়েছেন, তাই তাঁর শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যক। অতএব আপনি যে ইলম অর্জন করেছেন, তার ক্ষেত্রে আবশ্যক হচ্ছে, আপনি এই ইলম, এই দীন ও এই আকীদার প্রতি দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করবেন।

আপনি মানব সমাজে এমন মানুষ দেখতে পাবেন, যাকে আল্লাহ তাআলা ইলম দিয়েছেন, তাকে দীনের বুঝ ও উপলব্ধি দিয়েছেন এবং তাকে ইলম অনুযায়ী আমলও করার তাওফীক দিয়েছেন। কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন যে, তার আশপাশের ওপর তার ইলমের কোনো প্রভাব পড়েনি। তার আশপাশের লোকেরা শির্কে লিপ্ত রয়েছে অথবা বিপথগামী হচ্ছে অথবা দীনের ব্যাপারে চরম শৈথিল্য প্রদর্শন করছে। অথচ সে কাউকে দাওয়াত দেয় না। এটা আসলেই এক বিরাট মুসীবত। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াত নয়। বরং তাঁর হিদায়াত হচ্ছে কোনো মানুষ যখন ইলম অর্জন করবে, তখন সেটা অন্যকে শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করবে এবং মানুষকে গোমরাহী থেকে হিদায়াতের দিকে ও ভ্রষ্টতা থেকে সঠিকতার দিকে আনয়ন করবে। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

“আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করবেন, যে আমার নিকট থেকে কিছু শ্রবণ করার পর হুবহু তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা

দূর থেকে খবরপ্রাপ্ত কতিপয় লোক উপস্থিত থেকে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে।”[১৭]

যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মাত্র একটি কথা শ্রবণ করে অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়, তার চেহারা উজ্জ্বল হওয়ার জন্য তিনি দুআ করেছেন। তাহলে যে ব্যক্তির নিকট অনেক ইলম, হাদীস ও বিশুদ্ধ আকীদা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু সে তার আশপাশের মানুষকে শিক্ষা দেয় না এবং কারো উপকার করে না, তার অবস্থা কেমন হবে? অবশ্যই তার অবস্থা ভয়াবহ হবে। কথায় ও কাজে ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে প্রথমত শিক্ষা অর্জন করে, অতঃপর আমল করে, অতঃপর অন্যকে দাওয়াত দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ﴾

“যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলিম, তার অপেক্ষা কথায় উত্তম আর কে হতে পারে?” (সূরা ফুসসিলাত ৪১:৩৩)

প্রিয় ভাই! জেনে রাখুন, আপনি যে বিষয়ে ইলম অর্জন করেছেন, সেদিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়ার দু’টি মাধ্যম রয়েছে।

এক. কথার মাধ্যমে। এটা আপনার জবানের কথার মাধ্যমে হতে পারে অথবা আপনার লেখার মাধ্যমে অথবা অন্যভাবেও হতে পারে।

দুই. কর্মের মাধ্যমে। আপনি আপনার কাজের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবেন। আপনি আদর্শ হবেন। শির্ক ও পাপাচারিতা মিটিয়ে ফেলার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবেন। তবে তা করতে গেলে যদি বড় কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে মিটিয়ে ফেলার পথ পরিহার করে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দেয়ার অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করবেন।

দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে দাঈদের যে বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক, তা হচ্ছে তারা সর্বপ্রথম সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়ে শুরু করবে। অতঃপর তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিবে।

দাঈর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, সে তার আশপাশের মানুষকে শির্ক ও পাপাচারিতায় লিপ্ত হতে দেখবে অথচ সে শির্কের প্রতিবাদ করা বাদ দিয়ে

[১৭] সহীহ: তিরমিযী, হা/২৬৫৭, সহীহ আল জামে হা/৬৭৬৪।

পাপাচারিতার প্রতিবাদ শুরু করবে। অতি উত্তম কাজের ওপর উত্তম কাজকে প্রাধান্য দেয়া মারাত্মক ভুল। বরং আপনার ওপর আবশ্যক হচ্ছে, আপনি মানুষকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আহব্বান জানাবেন। আর সেটা আল্লাহর তাওহীদের প্রতি আহব্বান করা।

যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের প্রতি গভীর দৃষ্টি ও তা নিয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা করবে, সে দেখতে পাবে যে, তিনি যখন মক্কায় ছিলেন, তখন তিনি মানুষের পাপাচারিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। কেননা তাদের মধ্যে মূল বিষয়টাই ছিল না। অর্থাৎ তাদের মধ্যে ইসলাম ও তাওহীদ ছিল না। তারা শির্কের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। তাই তিনি সর্বপ্রথম তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিতেন এবং শির্ক বর্জন করার আহব্বান জানাতেন। অতঃপর যখন এটা বাস্তবায়ন হলো, তখন তিনি অন্যান্য বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন।

চতুর্থ বিষয়ঃ দাওয়াতের ক্ষেত্রে কষ্টের সময় সবর করা

(الصبر على الأذى فيه)

চতুর্থ বিষয় হচ্ছে, সবর যা ধৈর্যের সাথে সম্পৃক্ত। দাঈ নিজেকে এই বলে শান্তনা দিবে যে, দাওয়াতের পথ ফুলশয্যা নয়। বরং এই পথ কষ্ট ও সঙ্কটপূর্ণ। এ জন্যই আল্লাহর দীনের দাঈ সবসময় তার মাথায় ও চোখের সামনে এটা রাখবে যে, তাকে অবশ্যই কষ্ট দেয়া হবে, তাকে পরীক্ষায় ফেলা হবে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। সে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কষ্টে নিপতিত হতে পারে। তাই তার ওপর সবর করা আবশ্যক। দু'টি কারণে তাকে এ পথে সবর-ধৈর্য অবলম্বন করা আবশ্যক।

(১) সে সবসময় মনে রাখবে যে, সে নবী-রাসূলদের পথে চলছে। তারা তার আগে এই দাওয়াতের পথে অগ্রণী। তারাও তার আগে এই পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝٢ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾

"মানুষেরা কি ধারণা করে যে, তাদেরকে এ কথা বলাতেই ছেড়ে দেয়া হবে যে, আমরা ঈমান এনেছি? এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা। এবং আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছি, যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে

জানতে পারেন এবং ইহাও জানতে পারেন যে, কারা মিথ্যাবাদী”। (সূরা আনকাবুত ২৯:২-৩)

যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীতে দৃষ্টি দিবে, সে দেখতে পাবে যে, তিনিও দাওয়াতের পথে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। পরিশেষে এই দীন আজ বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। আল্লাহর তাওফীক অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরে আগমনকারী দাঈদের সবরের ফলেই তা সম্পন্ন হয়েছে।

(২) সে সবসময় মনে রাখবে যে, সে তার মহান প্রতিপালকের নিকট এই কঠিন কাজের বিনিময় পাবে। পরীক্ষা অনুপাতেই আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বাড়াবেন ও বিনিময় দিবেন। লোকেরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলো, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,

«أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً قَالَ الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ»

“লোকদের মধ্যে কাকে সবচেয়ে কঠিন মুসীবতে ফেলা হয়? জবাবে তিনি বললেন, নবীগণকে। অতঃপর সর্বাধিক ভালো লোকদেরকে। এরপর অন্যান্য ভালো লোকদেরকে। মানুষকে তার দীন অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। দীন পালনে যদি সে মজবুত হয়, তার মুসীবতও কঠিন হয়। দীন পালনে সে যদি দুর্বল হয়, তাহলে তার দীন অনুযায়ীই তাকে মুসীবতে ফেলা হয়। বান্দাকে মুসীবতে ফেলে পরীক্ষা নেওয়া হতেই থাকে, এমন কি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাকে এমন পর্যায়ে রাখেন যে, সে জমিনে এমন অবস্থায় চলাফেরা করে যে, তার কোন গুনাহ থাকে না”।[১৮]

সুতরাং দাওয়াতের পথে এবং এ পথে যেসব কষ্ট আপনার ওপর আপতিত হবে, তার ওপর সবর করা আবশ্যক। এসব কষ্ট আল্লাহ তাআলার

[১৮] সহীহ: তিরমিযী, অধ্যায়: মুসীবতে সবর করার ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। দেখুন সহীহুত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৩৪০২। ইমাম দারেমী, ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করার পর হাসান সহীহ বলেছেন। আস সহীহ হা/১৪৩।

পক্ষ হতে আপনার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ দেখতে চান, আপনি কি দাওয়াতের পথে অটল থাকেন নাকি পিছিয়ে যান? আপনি কি সবর করেন নাকি বিরক্তি প্রকাশ করেন? অতএব হে তালিবুল ইলম ও দাঈ! আপনার ওপর সবর করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত আপনার সবরের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক।

সবরের প্রকারভেদ:

আলেমগণ সবরকে তিনভাবে বিভক্ত করেছেন।

(১) **আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের কাজে কষ্টের সময় সবর করা।** যেমন সালাত আদায় করা, হজ্জ করা, সিয়াম রাখার ওপর সবর করা। এই ইবাদতগুলো বাস্তবায়ন করতে গেলে কমবেশি কষ্ট হয়।

(২) আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে নফস্‌কে বাঁধা প্রদান করা এবং নফ্‌স যেসব হারাম কাজের প্রতি ধাবিত হতে চায়, তা থেকে নফ্‌সকে আটকিয়ে রাখা এবং

(৩) ভাগ্যের কষ্টদায়ক বিষয় ও তিক্ততার ওপর ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহর দীনের তাবলীগ করার পথে আপনার যে কষ্ট হবে, তাতে সবর করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ জিহাদুন নফ্‌স সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উপরোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, নফ্‌সের সাথে জিহাদ করার চারটি স্তর রয়েছে।

(১) হিদায়াত ও সত্য দীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার ব্যাপারে নফ্‌সের সাথে জিহাদ করবে। অর্থাৎ নফ্‌স এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে না চাইলেও এর ওপর নফ্‌সকে বাধ্য করবে। কেননা এটা ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম ও সৌভাগ্যবান হওয়ার কোনো পথ নেই। যার কাছে এ সম্পর্কে ইলম না থাকবে, সে উভয় জগতে দুর্ভাগ্যবান হবে।

(২) ইলম অর্জন করার পর সে অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে নফ্‌সের সাথে জিহাদ করবে। কেননা আমলবিহীন ইলম কারো জন্য উপকারী নয়।

(৩) ইলমের প্রতি দাওয়াত দেয়া ও তা মানুষকে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে নফ্‌সের সাথে জিহাদ করবে। অন্যথায় আল্লাহর নাযিলকৃত হিদায়াত ও দলীল প্রমাণ গোপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যে ব্যক্তি তার ইলমের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না, তার ইলম তার কোনো উপকার করবে না এবং তাঁকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাও করবে না।

(৪) আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে সবর করার ওপর এবং মানুষের কষ্টের ওপর সবর করার জন্য নফ্‌সের সাথে জিহাদ করবে। এসব কিছু সে আল্লাহর জন্যই সহ্য করবে। অতঃপর ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি এই স্তরগুলো পূর্ণ করতে সক্ষম হবে, সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা সালাফগণের ঐকমত্যে আলেম কখনো আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয় না, যতক্ষণ না সে সত্য সম্পর্কে জানে, অতঃপর সে অনুযায়ী আমল করে এবং তা অন্যকে শিখায়। অতএব যে আলেম সত্য সম্পর্কে জানে, আমল করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়, তাকে সাত আসমানের উর্ধ্বজগতে মহা মর্যাদাবান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[১৯]

অতঃপর সম্মানিত শাইখ বলেন,

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣﴾ **[العصر: ١ – ٣]**

উপরে উল্লেখিত চারটি বিষয়ের দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

﴿وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣﴾

“মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনয়ন করে, সৎকাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। আর যারা উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের”। সূরা আল আসর ১০৩:১-৩।

....

সহজ ব্যাখ্যা:

লেখক চারটি বিষয় উল্লেখ করার পর তার পক্ষে সূরাতুল আসর দিয়ে দলীল পেশ করেছেন।

---

[১৯] দেখুন, যাদুল মাআদ, (৩/৯)

আল্লাহর বাণী, وَٱلۡعَصۡرِ মহাকালের শপথ: মহাকাল বা যামানাকে আসর বলা হয়। আল্লাহ তাআলা মহাকাল ও যামানার শপথ করেছেন। কেননা এর বিরাট মর্যাদা রয়েছে। কাল বা যামানা এ জন্যই মর্যাদাবান যে, তাতেই বান্দা তার মহান প্রতিপালকের ইবাদত করে থাকে।

আল্লাহর বাণী, إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত: সমস্ত মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, **إِنَّ الْإِنْسَانَ** এখানে আলিফ-লাম জিন্স বা ইস্তেগরাকের জন্য এসেছে। যার অর্থ হলো গোটা মানব জাতি। অর্থাৎ মানব জাতির সবাই মহাক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে অত্র সূরায় যাদেরকে ক্ষতি থেকে আলাদা করা হয়েছে, তাদের কথা ভিন্ন।

প্রিয় পাঠক! আপনি চিন্তা করুন। আল্লাহ তাআলা সূরাতুল আসরের এই আয়াত ও তার বিষয়কে তিনটি তাকীদ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।

(১) আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَٱلۡعَصۡرِ "আসরের শপথ"। আসলে শপথ বাক্যের বিষয়কে শক্তিশালী করে।

(২) **إِنَّ** "অবশ্যই"। এখানে إِنَّ অক্ষরটি নসব ও তাকিদের জন্য এসেছে।

(৩) **لَفِي خُسْرٍ** "অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত"। এখানে লাম অক্ষরটি إِنَّ এর খবরের শুরুতে এসেছে। এটাও তাকীদের জন্য এসে থাকে।

আল্লাহর বাণী, " إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনয়ন করে": তবে আল্লাহ যাদেরকে আলাদা করেছেন, তারা ব্যতীত। আর এই আলাদাকৃত লোকেরা হলো তারাই, যারা ইতিপূর্বে আলোচিত চারটি বিষয় বাস্তবায়ন করেছে। বিষয় চারটি হচ্ছে: ঈমান, আমল, দাওয়াত ও সবর।

আল্লাহর বাণী, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ যারা সৎকাজ করে: অর্থাৎ যারা ইলম অর্জন করার পর আমল করে।

আল্লাহর বাণী, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ যারা পরস্পরকে সত্যের উপদেশ উপদেশ দেয়: অর্থাৎ তারা আল্লাহর দীনের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়।

আল্লাহর বাণী, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ আর যারা উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের: অর্থাৎ এই বিরাট দীনের দাওয়াতে পথে তাদের ওপর যেসব কষ্ট আসে, তাতে তারা সবর করে।

সূরা আসরের সারমর্ম হচ্ছে মানুষ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত।

(১) ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও

(২) লাভবান মানুষ।

লাভবান মানুষ তারাই, যারা ঈমান আনয়ন করেছে, সৎআমল করেছে, সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং সবরের উপদেশ দিয়েছে। যে ব্যক্তি এই চারটি গুণাবলি অর্জন করেছে, সে পরিপূর্ণ লাভবান হওয়ার মাধ্যমে ও চির সৌভাগ্যবান, মর্যাদাবান এবং দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা হাসিল করার দ্বারা সফলকাম হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এসব গুণাবলি অর্জন করতে পারবে না, এগুলো থেকে যে পরিমাণ গুণাবলি তার হাত ছাড়া হবে, সে অনুপাতেই তার কল্যাণ হাতছাড়া হবে এবং তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, অমনোযোগিতা ও তার ওপর আবশ্যক বিষয়াদি থেকে বিমুখিতা অনুযায়ী সে লোকসান ও বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত হবে।

অতঃপর সম্মানিত শাইখ বলেন,

قال الشافعي رحمه اله تَعَالَى: لَوْ مَا أَنْزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ.

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাআলা যদি তাঁর সৃষ্টির ওপর এই সূরাটি ছাড়া আর কোনো হুজ্জাত (দলীল-প্রমাণ) নাযিল না করতেন, তাহলে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।

....

সহজ ব্যাখ্যা:

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ এর উক্তিটি আমরা চারটি পর্যায়ে আলোচনা করবো।

প্রথমত: ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ এর নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ। তিনি ছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ আলেম। তার প্রতিই শাফেঈ মাযহাবের সম্বন্ধ করা হয়। এই সূরার বিরাট মর্যাদার কারণেই তিনি উপরোক্ত কথা বলেছেন। সূরাটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং তার আয়াত

সংখ্যা কম হলেও তার মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ রয়েছে। মানব জাতির পথ প্রদর্শক ও তাদের জীবনের আলোর প্রদীপ হিসেবে এই সূরাটি ব্যতীত আর কোনো সূরা নাযিল না করা হলে তাদের এটাই যথেষ্ট হতো। কেননা এই সূরার মধ্যে এই চারটি বিষয় রয়েছে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফেঈর কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, মর্যাদার স্তর হচ্ছে চারটি। এগুলো পরিপূর্ণরূপে অর্জন করার মাধ্যমেই একজন লোক পরিপূর্ণ কামালিয়াত হাসিল করতে পারে।

(১) সত্য সম্পর্কে জানা।

(২) সে অনুযায়ী আমল করা।

(৩) যারা জানে না, তাদেরকে এটা শিক্ষা দেয়া।

(৪) এটা শিখতে, এ অনুযায়ী আমল করতে এবং মানুষকে এটা শিখাতে গিয়ে ধৈর্যধারণ করা।

আল্লাহ তাআলা মর্যাদার এই চারটি স্তর সূরা আসরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং আসরের শপথ করে বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে যারা চারটি স্তর বাস্তবায়ন করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

(১) যারা ঈমান আনয়ন করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ঈমানদার তারাই, যারা সত্য জেনেছে এবং তাকে সত্যায়ন করেছে। এটা হচ্ছে প্রথম স্তর।

(২) সৎআমল করবে। সৎআমলকারী তারাই, যারা সত্য জানার পর সে অনুযায়ী আমল করে। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় স্তর।

(৩) পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিবে। অর্থাৎ তাদের কতিপয় লোক অন্যদেরকে সত্য সম্পর্কে জানা ও শিক্ষা দেয়ার উপদেশ দিবে। এটা হচ্ছে তৃতীয় স্তর।

(৪) পরস্পরকে সবরের উপদেশ দিবে। তারা সত্যের ওপর সবর করবে এবং সত্যের ওপর সবর করতে তাদের একজন অন্যজনকে উপদেশ দিবে। এটা হচ্ছে চতুর্থ স্তর।

এগুলোই কামালিয়াত অর্জনের মাধ্যম। কামালিয়াত অর্জন করতে হলে সর্বপ্রথম নিজে কামেল হতে হবে এবং অন্যকে কামেল বানাতে হবে। ইলম ও আমলের শক্তিকে মজবুত করার মাধ্যমে নিজেকে পরিপূর্ণ করা যায়। ঈমানের মাধ্যমে ইলমী শক্তি সঠিক হয়। সৎ আমলের মাধ্যমে আমলগত

শক্তি মজবুত হয়। অন্যকে সত্য শিক্ষা দেয়া, তার ওপর সবর করা এবং ইলম ও আমলের ওপর অন্যকে সবরের উপদেশ দেয়ার মাধ্যমেই অন্যকে কামেল বানানো যায়। তাই সূরাটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাতে সব কল্যাণ বিদ্যমান রয়েছে। সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তাঁর কিতাবকে অন্যসব জিনিসের বদলে যথেষ্ট বানিয়েছেন, সমস্ত রোগের চিকিৎসা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং প্রত্যেক কল্যাণের প্রতি পথপ্রদর্শক বানিয়েছেন।[২০]

দ্বিতীয়ত: আলেমগণ বলেছেন, এই সূরার মধ্যে রয়েছে শাস্তির বিরাট ধমক। কেননা আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষের ওপর এই হুকুম প্রয়োগ করেছেন। তবে তাদের ওপর নয়, যারা এই চারটি বিষয় বাস্তবায়ন করবে। সেগুলো হচ্ছে ঈমান, সৎ আমল, সত্যের পারস্পরিক উপদেশ প্রদান ও সবরের পারস্পরিক উপদেশ প্রদান। এ বিষয়গুলো একসঙ্গে বাস্তবায়ন করার মধ্যেই রয়েছে নাজাত। দৃঢ়তা প্রদান ও গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই পারস্পরিক উপদেশ কথাটা সূরার মধ্যে একাধিকবার এসেছে। প্রথম উপদেশ প্রদান তথা সত্যের প্রতি পারস্পরিক উপদেশ প্রদান এর মধ্যে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের বিষয়টি রয়েছে। আর দ্বিতীয় উপদেশ প্রদান তথা সবরের প্রতি পারস্পরিক উপদেশ প্রদান এর মধ্যে সত্যের ওপর সুদৃঢ় থাকার বিষয়টি রয়েছে। প্রথম উপদেশ দ্বারা সৎকাজের উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় উপদেশ দ্বারা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত: ইমাম শাফেঈর কথার ওপর আপত্তি করে যদি বলা হয়, মানুষের জন্য কীভাবে এই সংক্ষিপ্ত সূরাটি যথেষ্ট হতে পারে? অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন। তাতে রয়েছেন অনেক হুকুম, বহু উপদেশ ও এমন অনেক সংবাদ যার একটি অন্যটির বদলে যথেষ্ট নয়।

এর জবাব হচ্ছে, উপদেশ প্রদান ও উপদেশ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের জন্য এই সূরাটি যথেষ্ট। মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রত্যেক বিবেকবান মানুষই জানে যে, সে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। যদি না এই চারটি গুণে গুণান্বিত হয়। মানুষ যখন জানতে পারবে যে, এই চারটি গুণ অর্জন না করলে ক্ষতির মধ্যে পরবে, তখনই সে সাধ্যানুসারে এগুলো অর্জনের চেষ্টা করবে এবং নিজেকে ক্ষতির কবলে পড়া থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে।[২১] তিনি আরো বলেন, ইমাম শাফেঈর কথার অর্থ এটা নয়

---

[২০] দেখুন, মিফতাহু দারিস সাআদাহ, (১/৫৭)।

[২১] দেখুন, শাইখের আম্মা পারার ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা নং ৩১৩।

যে, শরীয়াতের সব বিধি-বিধান জানার ক্ষেত্রে মানুষের জন্য এই সূরাটি যথেষ্ট।[২২]

চতুর্থতঃ এই সূরা সম্বন্ধে ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, লোকেরা এই সূরা সম্পর্কে উদাসীন। সকল মানুষ বিশেষ করে তালিবুল ইলম এর উচিত এই সূরাটি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা ও এর অর্থ বাস্তবায়ন করা। যাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সময় লাভবান হয়। কিন্তু অনেক মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণগুলো হবে বিভিন্ন। তাদের কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঈমান আনয়ন না করে, কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইলম অর্জন না করে, কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমল না করে আবার কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কষ্টের ওপর সবর না করে। প্রকৃতপক্ষে সৌভাগ্যবান হওয়ার তাওফীক প্রাপ্ত হবে ঐ ব্যক্তি, যে এই চারটি স্তর একসাথে বাস্তবায়ন করবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

অতঃপর সম্মানিত শাইখ বলেন,

وَقَالَ البُخَارِيُّ رحمه الله تعالى (بَابُ) " العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ١٩] فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ ."

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ অধ্যায়: কথা ও কাজের পূর্বে ইলম অর্জন করা আবশ্যক। এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

“জেনে রেখো, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই। অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার গুনাহের জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য”। (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯) আল্লাহ তাআলা কথা ও কাজের আগে ইলম আবশ্যক করেছেন।

....

সহজ ব্যাখ্যা:

---

[২২] দেখুন, শাইখের তিনটি মূলনীতির ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা নং ২৭।

ইমাম বুখারী হলেন মুহাদ্দিসদের ইমাম। তার কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ, নাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল। তিনি তাঁর প্রতি সম্বন্ধিত সহীহ গ্রন্থটির প্রণেতা। সহীহুল বুখারী হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের পরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। তিনি বলেছেন, কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সকলেই জানেন যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার সহীহ গ্রন্থে যেসব শিরোনাম বেঁধেছেন, তাতে তাঁর ইলমের গভীরতা ও সূক্ষ্মতা জানা যায়। এটা তাঁর কিতাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর শিরোনামগুলো সবচেয়ে সুন্দর। এগুলোর বৈশিষ্ট হলো, তিনি তাতে বিভিন্ন মাসআলা উল্লেখ করেছেন। এগুলোর ইবারাত উন্নত মানের। তিনি এই অধ্যায় বেঁধেছেন,

بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ "অধ্যায়: কথা ও কাজের পূর্বে ইলম থাকা জরুরী"। অতঃপর এই কথার দলীল হিসেবে তিনি আল্লাহ তাআলার এই বাণী উল্লেখ করেছেন,

﴿**فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ**﴾

"জেনে রেখো, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই। অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার গুনাহর জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য"। (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯)

আয়াত থেকে ইমাম বুখারীর দলীল গ্রহণ করার পদ্ধতি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এখানে কথা ও কাজের পূর্বে ইলমকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর সেটা হচ্ছে,

﴿**فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ**﴾

"জেনে রেখো, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই"। আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম ইলমের কথা উল্লেখ করেছেন। এটা ইলমের গুরুত্ব বুঝাচ্ছে।

যাই হোক, লেখক তিনটি মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে এই চারটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন। কেননা এতে ইলমের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যাতে আপনি এরপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। আপনি যখন ইলমের মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং এটা জানতে পারবেন যে, আল্লাহ তাআলা ইলমকে আমলের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, তখন আপনি এরপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিবেন।

অতঃপর সম্মানিত শাইখ বলেন,

(اعْلَمْ) رَحِمَكَ اللهُ أَنَّه يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعَلُّمُ هَذِهِ الثَّلاثِ مَسَائِل والْعَمَلُ بِهِنَّ.

জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ও সে অনুযায়ী আমল করা জরুরী।

....

সহজ ব্যাখ্যা:

লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর এ তিনটি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা ও সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। এই বিষয় তিনটি সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর এগুলো বুঝা আবশ্যক। এগুলো বাস্তবায়ন করা হলো কি না, সে ব্যাপারে নিজের নফ্সের খোঁজ-খবর নেয়া আবশ্যক। যদিও এগুলো সকলের জানা আছে, তারপরও এগুলো বাস্তবায়ন করা মানুষের পক্ষে কঠিন।

অতঃপর সম্মানিত শাইখ বলেন,

(الأُولَى) أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلا بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ رَسُولٗا شَٰهِدًا عَلَيۡكُمۡ كَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ رَسُولٗا ١٥ فَعَصَىٰ فِرۡعَوۡنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذۡنَٰهُ أَخۡذٗا وَبِيلٗا﴾ **[المزمل: ١٥ – ١٦]**

সর্বপ্রথম (১) যে বিষয়টি জানা আবশ্যক, তা হলো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং রিযিক প্রদান করেছেন। তিনি আমাদেরকে কোনো দায়িত্ব না দিয়ে ছেড়ে দেননি; বরং তিনি আমাদের জন্য রাসূল পাঠিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে ব্যক্তি তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ رَسُولٗا شَٰهِدًا عَلَيۡكُمۡ كَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ رَسُولٗا ١٥ فَعَصَىٰ فِرۡعَوۡنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذۡنَٰهُ أَخۡذٗا وَبِيلٗا﴾

“নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি তোমাদের ওপর সাক্ষীরূপে। যেমন পাঠিয়েছিলাম একজন রাসূল ফেরাউনের প্রতি। কিন্তু ফেরাউন তার নিকট প্রেরিত রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করলো। ফলে আমি তাকে পাকড়াও করলাম অত্যন্ত কঠোরভাবে। (সূরা আল-মুযাম্মিল ৭৩:১৫-১৬)

....

সহজ ব্যাখ্যা:

শাইখের উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যে তিনটি বিষয় রয়েছে।

(১) প্রথম বিষয়: এতে সম্মানিত লেখক মানুষ সৃষ্টির হিকমত ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তাতে এই হিকমত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার পদ্ধতিও উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা যে হিকমত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তা হচ্ছে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে। আল্লাহ অনর্থক সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেননি এবং তাদেরকে অযথা অস্তিত্বে আনয়ন করেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

“তোমরা কি ধারণা করো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? (সূরা মুমিনুন ২৩:১১৫)

কখনো নয়; বরং আল্লাহ তাআলা বিনা হিকমতে কোনো জিনিস সৃষ্টি করার বহু উর্ধ্বে। তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য, কে সর্বোত্তম আমল করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

“আমি জিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি”। (সূরা যারিয়াত ৫১:৫৬)

এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছু বনী আদমের বশীভূত করেছেন এবং যাতে সে তার প্রতিপালকের ইবাদত করতে পারে। এই অর্থেই কুরআনের এমন অনেক আয়াত এসেছে, যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বনী আদমের জন্যই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও সুঠাম করেছেন এবং বশীভূত করেছেন। কিন্তু বনী

আদমকে মাত্র একটি বিরাট জিনিসের জন্য ও মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তা হচ্ছে সে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে।

আপনি যখন জানতে পারবেন যে, এই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা, তখন এই মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পদ্ধতিও জানা আবশ্যক।

আল্লাহর ইবাদত বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশের অনুসরণ করা এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকা। এই পদ্ধতিতেই আমরা আমাদের প্রতিপালকের হুকুমসমূহ জানতে পারবো। আমরা জেনে-বুঝে আমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবো। যেমনটা আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন। রাসূলগণের দায়িত্ব ছিল কেবল মানুষের জন্য রাস্তা বলে দেয়া। যাতে তারা প্রতিপালকের ইবাদত করতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা ব্যতীত আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছা এবং আল্লাহর দীন বাস্তবায়নের জন্য আর কোনো পথ নেই। আপনার ওপর জানা আবশ্যক হলো, যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে যাবে। এই হিকমত ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের আদেশ দেয়ার জন্যই ও মানুষের জন্য তা বর্ণনা করার জন্যই একের পর এক রাসূল আগমন করেছেন। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ﴾

"আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। তাঁর মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো"। (সূরা আন নাহল ১৬:৩৬)

(২) দ্বিতীয় বিষয়: আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝١٥ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি তোমাদের ওপর সাক্ষীরূপে। যেমন পাঠিয়েছিলাম একজন রাসূল ফেরাউনের প্রতি। কিন্তু ফেরাউন তার নিকট প্রেরিত রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করলো। ফলে আমি তাকে পাকড়াও করলাম অত্যন্ত কঠোরভাবে। (সূরা আল-মুযাম্মিল ৭৩:১৫-১৬)

আল্লাহ তাআলার কথা: وَبِيلًا এর অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত কঠোর ও ধ্বংসাত্মক। কারণ, আল্লাহ তাআলা যখন মূসা আলাইহিস সালামকে ফেরআউন ও তার জাতির জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করলেন, তখন তার প্রতি কুফুরী করার কারণে আল্লাহ ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনীকে সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন। এতে মক্কাবাসী ও অন্যান্য লোকদের জন্য সতর্কবাণী রয়েছে যে, নবীদের বিরোধিতাকারী ও তাদের দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের পরিণাম হচ্ছে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে ধ্বংস করবেন এবং আখেরাতে তাদের জাহান্নামে পাঠাবেন। যেমন তিনি ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে দুনিয়াতে ধ্বংস করেছেন ও আখেরাতে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ﴾

আর ফেরাউনের সম্প্রদায়কে জাহান্নামের আগুন বেষ্টন করে ফেলেছে। সেই আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদেরকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো"। (সূরা গাফির/মুমিন ৪০:৪৬) আমরা আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা চাই।

এই জন্যই নবীদের ব্যাপারে আবশ্যক হচ্ছে, তাদের অনুসরণ করা এবং নবীগণের বিবরণ মোতাবেক আল্লাহর ইবাদত করা। যারা এটা করবে, তাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে জান্নাত। আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহেই এটা হবে।

(৩) তৃতীয় বিষয়: অতঃপর লেখক আল্লাহ তাআলার রুবুবীয়াত ও উলুহীয়াতের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। রুবুবীয়াতের বিষয়ে লেখক বলেন, আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ও আমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। এই কথার মধ্যে রয়েছে তাওহীদুর রুবুবীয়াহ। এটা এমন বিষয়, যাতে মানুষ কোনো মতভেদ করেনি। এই জন্যই লেখক এদিকে ইঙ্গিত করেননি। তিনি এটা বলেননি, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই এবং তিনি ছাড়া আর কোনো রিযিক দাতা নেই, সে জান্নাতে যাবে; বরং তিনি বলেছেন, যে তার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে যাবে। এটাই হচ্ছে মতভেদের বিষয়। মানুষ এতেই মতভেদ করেছে। মানুষ তাওহীদুল উলুহীয়াত সম্পর্কেই মতভেদ করেছে।

অতঃপর সম্মানিত শাইখ বলেন,

(الثَّانِيَةُ) أَنَّ الله لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ معه فِي عبادته أحد لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾ **[الجن: ١٨]**

দ্বিতীয় (২) যে বিষয়টি জানা আবশ্যক, তা হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করা মোটেই পছন্দ করেন না। চাই সে নৈকট্যশীল কোনো ফেরেশতা হোক অথবা কোনো প্রেরিত নবী হোক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾

“মসজিদসমুহ আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই। অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে ডেকো না”। (সূরা আল-জিন ৭২:১৮)

....

সহজ ব্যাখ্যা:

এই অংশ দ্বারা শাইখ আপনাকে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আপনি যখন জানতে পারবেন যে, আল্লাহ আপনাকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তখন জানা আবশ্যক যে, আল্লাহর ইবাদত বাস্তবায়নের পদ্ধতি হচ্ছে আপনি একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবেন এবং ইবাদতের মাধ্যমে তাঁকে একক করবেন। আপনার আমল ও ইবাদতে একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আপনি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেন না। যদিও সে ফেরেশতা হোক। এমনকি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা হলেও। যেমন জিবরীল আলাইহিস সালাম। যদিও সে আল্লাহর নবী ও রাসূল হোক। অর্থাৎ নবুওয়াত ও রিসালাতের অধিকারী হোক। আপনি যখন জানতে পারবেন যে, আল্লাহর সাথে এদেরকে শরীক করা যাবে না, তখন এদের ব্যতীত অন্যদের শরীক করা তো আরো কঠোরভাবেই নিষিদ্ধ।

ইবাদতের প্রকৃত অর্থ:

العبادة শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সর্বোচ্চ নতি স্বীকার করা ও বিনীত হওয়া। العبادة শব্দটির আইন বর্ণে কাসরা (জের) দিয়ে পড়লে এর অর্থ হবে, আনুগত্য করা। কিছু কিছু ভাষাবিদ বলেছেন, শব্দটির মূল হচ্ছে

العبودية অর্থাৎ নতি স্বীকার করা ও বিনীত ও লাঞ্ছিত-পদ দলিত হওয়া।[২৩] যেমন বলা হয়ে থাকে طريق معبد অর্থাৎ পদ দলিত-লাঞ্ছিত পথ। অর্থাৎ অধিক পরিমাণ চলাচল করার মাধ্যমে ও পা ফেলার কারণে লাঞ্ছিত-পদ দলিত পথ।

ইমাম কুরতুবী বলেন, প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের ওপর শরীয়াতের নির্ধারিত বিধি-বিধানকে ইবাদত হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা তারা আল্লাহর জন্য বিনীত ও বশীভূত হয়ে এগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে।[২৪]

আর পরিভাষায় ইবাদতের দু'টি অর্থ রয়েছে।

(১) ইবাদত শব্দটি التعبد অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এটা হচ্ছে ইবাদতকারীর কাজ। এটাকেই আল্লাহর আদেশসমূহ বাস্তবায়ন করা ও তাঁর নিষেধসমূহ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে তাঁর জন্য বিনীত হওয়া ও নতি স্বীকার করার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। বলা হয়ে থাকে, هذا متعبد لله بالخضوع والذل "এই ব্যক্তি বশীভূত ও বিনীত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নতি স্বীকার করছে।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ ইবাদতের সংজ্ঞায় বলেন, শরীয়াতসম্মত পদ্ধতিতে ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে আল্লাহর আদেশসমূহ বাস্তবায়ন করা ও তাঁর নিষেধসমূহ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে আল্লাহর সামনে নতি স্বীকার করাকে ইবাদত বলা হয়।[২৫]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ তার প্রসিদ্ধ কাসীদাহ আন-নূনীয়াতে ইবাদতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

وعبادة الرحمن غاية حبه ... مع ذل عابده هما قطبان

وعليهما فلك العبادة دائر ... ما دار حتى قامت القطبان

ومداره بالامر أمر رسوله ... لا بالهوى والنفس والشيطان

---

[২৩] দেখুন, তাজুল উরূস, (৮/৩৩০)।

[২৪] দেখুন, আল-মুফহিম, (১/৯৬)।

[২৫] শারহুল উসূল আস-সালাসাহ, পৃষ্ঠা নং ৩৭।

ইবাদতকারীর নতি স্বীকার করাসহ আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসাকে ইবাদত বলা হয়। এ দু'টিই অর্থাৎ নতি স্বীকার করা ও ভালোবাসা ইবাদতের অক্ষদণ্ড। এ দু'টির ওপরই ইবাদতের নক্ষত্র ঘূর্ণায়মান। এ দু'টি প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া ইবাদতের নক্ষত্র চলাচল করতে পারে না। আল্লাহর রাসূলের আদেশই ইবাদতের নক্ষত্রের কক্ষপথ। প্রবৃত্তি, নফ্স কিংবা শয়তানের আদেশ নয়।

(২) ইবাদত শব্দটি المتعبد به (ইবাদতের মাধ্যম) অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন সালাত, সিয়াম এবং অনুরূপ সর্বপ্রকার ইবাদত। এই অর্থেই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ ইবাদতের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আর শরীয়াতের পরিভাষায়,

العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة

"ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। মানুষের প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য কথা ও কাজের মধ্য থেকে যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন, সেগুলোর নামই ইবাদত।[২৬]

শাইখ আল-হাকামী রহিমাহুল্লাহ ইবাদতের সংজ্ঞায় বলেন,

ثُمَّ الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعُ لِكُلِّ مَا يَرْضَى الْإِلَهُ السَّامِعُ

মানুষের যেসব বিষয় (কথা ও কাজ) শ্রবণকারী মা'বুদ পছন্দ করেন, তার প্রত্যেকটিকেই ইবাদত বলা হয়।

ইবাদতের শ্রেণি বিন্যাসঃ ইবাদত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত।

(১) মৌলিক ইবাদত। এগুলো হচ্ছে এমন কাজ, যা শরীয়াত প্রণেতার মাধ্যম ছাড়া জানা অসম্ভব।

(২) অমৌলিক ইবাদত। এগুলো এমন কথা ও কাজের নাম, যেগুলো শরীয়াতের দিক থেকে মূলত ইবাদত নয়। কিন্তু সৎ নিয়্যাতের কারণে সেগুলো ইবাদতে পরিণত হয়েছে।[২৭]

---

[২৬] দেখুন, আল-উবুদীয়াত, পৃষ্ঠা নং ৪৪।

[২৭] আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, (৫/১৫৪)

ইবাদতের শর্ত: ইবাদতের দু'টি শর্ত রয়েছে।

(১) আল-ইখলাস: যে ইবাদতটি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, আল্লাহ তাআলা তা ব্যতীত অন্য কোনো ইবাদত কবুল করেন না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ﴾

"তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক দীন"। (সূরা বায়্যিনাহ ৯৮:৫) আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ۝٢ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ﴾

"অতএব তুমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করো। জেনে রাখো, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই"। (সূরা যুমার ৩৯:২-৩)

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ: আল্লাহ তাআলা কেবল সেই ইবাদতই কবুল করেন, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিদায়াত ও সুন্নাত মোতাবেক করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾

"তোমাদের রাসূল তোমাদেরকে যে বিষয়ের আদেশ করেন, তা তোমরা পালন করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো"। (সূরা আল হাশর ৫৯:৭) আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا﴾

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে পর্যন্ত তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মেনে নেয়। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নেবে"। (সূরা আন নিসা ৪:৬৫)

ইবাদতের রুকন: ইবাদতের দু'টি রুকন রয়েছে।[২৮]

(১) পরিপূর্ণ বিনয়: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বান্দা আল্লাহর সামনে নত, বিনম্র, নীচ ও বশীভূত হবে। যখনই সে কোনো আদেশ বা নিষেধ শ্রবণ করবে, তখনই তা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার জন্য বশীভূত ও বিনীত হবে।

(২) পরিপূর্ণ ভালোবাসা: আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল বাকারার ১৬৫ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ﴾

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহর সমতুল্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদেরকে এমন ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিৎ। কিন্তু যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী"। সূরা আল বাকারা ২:১৬৫।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবাদতের মধ্যে পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও পরিপূর্ণ বিনয় থাকা আবশ্যক। সুতরাং ইবাদতকারী অবশ্যই ভালোবাসা পোষণকারী ও বিনয়ী হবে। ঐ ব্যক্তির মত হবে না, যে অন্য কাউকে ভালোবাসে; কিন্তু তার জন্য বিনয়ী হয় না। বরং সে তাকে শুধু অন্য একটি প্রিয় বস্তু পাওয়ার জন্য ভালোবাসে। অনুরূপ ইবাদতকারী ঐ ব্যক্তির মত হবে না, যে অন্য কারো জন্য বিনয়ী হয়; কিন্তু তাকে মোটেও ভালোবাসে না। যেমন কেউ অত্যাচারী যালেমের সামনে নত

---

[২৮] আলেমগণ বলেন, ইবাদতের মোট রুকন চারটি। (১) أقصى غاية الحب সর্বোচ্চ ভালোবাসা, (২) أقصى الخضوع والتذلل সর্বোচ্চ বিনয়, (৩) الخوف ভয় এবং (৪) الرجاء আশা। এই চারটি রুকন কোন আমলের মধ্যে এক সাথে পাওয়া গেলে, তা ইবাদতে পরিণত হবে। সুফীরা শুধু ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। এ জন্যই তারা গোমরাহ হয়েছে। আর যারা শুধু আশা নিয়ে ইবাদত করে, তারা মুরজীয়া। আর খারেজীরা শুধু অন্তরে ভয় নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা উপরোক্ত চারটি বিষয় অন্তরে নিয়েই আল্লাহর ইবাদত করেন। তারা একই সাথে অন্তরে আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা নিয়ে, তাঁর সামনে পূর্ণরূপে নত হয়ে, তাঁর শাস্তির ভয়সহ এবং তাঁর রহমতের আশা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করেন।

হয়; কিন্তু সে তাকে ভালোবাসে না। তাই উপরোক্ত দুই ব্যক্তির কেউই ইবাদতকারী নয় এবং তাদের কারো কাজ ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়।[২৯]

ইবাদতের প্রকারভেদ: ইবাদত দুই প্রকার।

(১) সৃষ্টি সম্পর্কিত ইবাদত। এটাকে রুবুবীয়াতের ইবাদতও বলা হয়। আর এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি সম্পর্কিত আদেশের প্রতি নত হওয়া, যা সমস্ত সৃষ্টিকে শামিল করে। কোনো সৃষ্টিই এই আদেশের বাইরে নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا﴾

"ধাকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছুই রাহমানের অনুগত বান্দা হয়ে উপস্থিত হবে।" সূরা মারইয়াম **১৯:৯৩**।

সুতরাং রুবুবীয়াতের ইবাদত মুমিন-কাফের ও অনুগত-পাপিষ্ঠ সকলকেই শামিলকারী।

(২) শরীয়াতগত ইবাদত। এটাকে আনুগত্য ও মান্য করার ইবাদত বলা হয়। আর এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার শরীয়াতের আদেশের সামনে বশ্যতা স্বীকার করা। আর এটা ঐসব লোকদের সাথে খাস, যারা আল্লাহ তাআলার অনুগত ও রাসূলদের আনীত শরীয়াতের অনুসরণকারী। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا﴾

"পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।" (সূরা ফুরকান ২৫:৬৩)

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আদায় করার দিক থেকে ইবাদতের শ্রেণি বিন্যাস: যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে ইবাদত বাস্তবায়ন করা হয়, সেগুলোর দিক থেকে ইবাদত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত।

(১) আকীদার সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত। যেমন ভালোবাসা, ভয় করা, আশা-আকাঙ্ক্ষা করা, আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, আতঙ্কিত হওয়া, অনুরাগী হওয়া, ভরসা করা ইত্যাদি।

---

[২৯] দেখুন, কায়েদা ফিল-মাহাব্বাহ, পৃষ্ঠা নং ৯৮।

(২) জবানের সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত। যেমন প্রশংসা করা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করা, তাসবীহ পাঠ করা, ক্ষমা চাওয়া, কুরআন তেলাওয়াত করা, দুআ করা ইত্যাদি।

(৩) শরীরের সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত। যেমন সালাত, সিয়াম, যাকাত দেয়া, হজ্জ করা, সাদাকাহ করা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ইত্যাদি।[৩০]

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, আপনার ওপর উপরোক্ত সর্বশ্রেণির ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। কেননা একমাত্র তিনিই ইবাদতের হকদার। তিনি ছাড়া যত মানুষ ও সৃষ্টি আছে, এগুলো সবই আল্লাহর সৃষ্টি। চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষরাজি ও পশু-পাখি এসব আল্লাহর জন্য সিজদাহ করে এবং তাঁর জন্য নত হয় ও তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে। অতএব আপনি কীভাবে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবেন? কীভাবে আল্লাহর সাথে অন্যকে আহব্বান করবেন? ইবাদতকে ইবাদত হিসেবে নামকরণ করা যাবে না, যতক্ষণ না তা আল্লাহর তাওহীদের সাথে মিলিত হবে। সম্মানিত শাইখ চারটি মূলনীতি নামক পুস্তিকায় বলেন, হে ভাই! আপনি জেনে নিন যে, তাওহীদ বিহীন কোনো ইবাদতকেই ইবাদত হিসেবে নামকরণ করা বৈধ নয়। যেমন অযু বিহীন সালাতকে সালাত হিসেবে নামকরণ করা যায় না। ইবাদতের মধ্যে যখন শির্ক প্রবেশ করে, তখন ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। যেমন অযু করার পর বায়ু বের হলে অযু ভেঙ্গে যায়।

সারকথা হচ্ছে, আপনি জেনে নিন যে, তাওহীদ বিহীন ইবাদত শুদ্ধ হয় না। তাওহীদ ছাড়া ইবাদত বাতিল। মুশরিকদের ইবাদতের কোনো মূল্য নেই। কেননা ইবাদত কবুলের শর্ত হচ্ছে, বান্দা তাঁর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক করবে এবং তার আমলকে আল্লাহ তাআলার জন্য খালেস করবে। এই কথার দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا﴾

[৩০] ইবনে কাইয়িম বলেন, দাসত্ব পনেরটি মূলনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। যে ব্যক্তি সেগুলোকে পূর্ণ করবে, সে দাসত্বের স্তরগুলোকে পূর্ণ করবে। এর বর্ণনা হলো, দাসত্ব অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাঝে ভাগ হয়ে আছে। এগুলোর প্রত্যেকটিরই নির্দিষ্ট দাসত্ব রয়েছে। তারপর তিনি এগুলো বর্ণনা করেন। আপনি চাইলে সেখান থেকে পড়তে পারেন। মাদারিজুস সালেকীন, ১/১২৯।

“মসজিদসমুহ আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে ডেকো না”। (সূরা আল-জিন ৭২: ১৮)

এখানে “أحدا কাউকে” শব্দটি নাকেরা বা অনির্দিষ্ট। তা না বোধক শব্দের পরে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ব্যাপকতার অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কাউকে ডাকা যাবে না। সে যে কেউ হোক না কেন। ফেরেশতা, নবী, পাহাড়, পাথর কিংবা কোনো সৎলোক অথবা অন্য যা কিছুই হোক না কেন। আপনি আল্লাহর সাথে কাউকে ডাকবেন না।

দুআর প্রকারভেদ: আলেমগণ দুআকে দুইভাবে বিভক্ত করেছেন।

(১) দুআউল মাসআলা বা চাওয়া সম্পর্কিত দুআ ও

(২) দুআউল ইবাদত সম্পর্কিত দুআ। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

সারকথা হচ্ছে, আপনার ওপর জানা আবশ্যক হচ্ছে, ইবাদতকে আল্লাহর জন্য খালেস না করা হলে এবং তাতে আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শির্ক করা থেকে মুক্ত করা না হলে কোনো ইবাদত সহীহ হিসেবে গণ্য হবে না। ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর সাথে তাঁর সর্বাধিক সৃষ্টিকে শরীক করা হলেও সেটা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না।

অতঃপর সম্মানিত শাইখ বলেন,

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللهَ لا يجوز له موالاة من حاد اله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تعالى ﴿لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱللَّهِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ **[المجادلة: ٢٢]**

তৃতীয় (৩) যে বিষয়টি জানা আবশ্যক, তা হলো, যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করবে এবং আল্লাহর তাওহীদ বাস্তবায়ন করবে, তার জন্য আল্লাহ

ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্বাচারণকারীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বৈধ নয়। যদিও সে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়। এ কথার দলীল হলো আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾

“যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্র দল। জেনে রাখো! আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে”। (সূরা মুজাদালা ৫৮:২২)

....

সহজ ব্যাখ্যা:

সম্মানিত শাইখের এই উক্তিটিকে আমরা চারটি স্তরে বিভক্ত করার প্রয়াস পাবো।

প্রথম স্তর: আপনার দীন ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন হবে না, যতক্ষণ না আপনি আল্লাহর জন্য কাউকে বন্ধু বানাবেন এবং আল্লাহর জন্য কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করবেন। আপনার ইসলাম এভাবে পরিপূর্ণ হবে যে, আপনি আল্লাহর জন্য ইবাদত করবেন এবং তাঁর ইবাদতে তাকে একক করবেন। সেই সঙ্গে মুসলিমদেরকে আপনার বন্ধু বানাবেন এবং কাফেরদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবেন। এ জন্যই ইসলামের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম হলো তাওহীদ ও আনুগত্যের সহিত এক আল্লাহ্র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা এবং শির্ক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা। আল্লাহ তাআলা সূরা মুমতাহিনার ৪নং আয়াতে বলেন,

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾

“তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সংঙ্গীগণের মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।” সূরা আল মুমতাহিনা ৬০:৪। অতএব দীনের মধ্যে রয়েছে ইবাদত, রয়েছে বন্ধুত্ব এবং রয়েছে শত্রুতা পোষণ।

দ্বিতীয় স্তর: الموالاة **শব্দটির মূল হচ্ছে** الولاية। এর অর্থ হচ্ছে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা। প্রত্যেক মুসলিম তার মুসলিম ভাইকে ভালোবাসবে এবং ধার্মিকতা অনুসারে তার প্রতি বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। এটাই সৌভাগ্য অর্জনের মাধ্যম। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ»

“তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারবে। (১) যার মধ্যে আল্লাহ এবং রাসূলের ভালোবাসা অন্যান্য সকল বস্তু হতে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকবে। (২) যে ব্যক্তি কোন মানুষকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ভালোবাসবে। (৩) যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে তেমনই অপছন্দ করবে, যেমন অপছন্দ করে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে”।[৩১]

অনুরূপ আপনি আল্লাহর জন্য শত্রুতা ও ঘৃণা করবেন। আপনি কাফেরদেরকে অপছন্দ করবেন এবং তাদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণাবোধ পোষণ করবেন। তাদের মধ্যে কুফুরী থাকার কারণে তাদেরকে ঘৃণা করতে হবে। তাদের প্রতি যেন আপনার অন্তরে ঘৃণাবোধ থাকে। কেননা তারা আপনার দীনকে ঘৃণা করে। তারা আপনার নবীকে মানে না এবং আপনার

---

[৩১] বুখারী, অধ্যায়: ঈমানের স্বাদ হা/১৬, মুসলিম হা/৪৩।

প্রতিপালকের ইবাদতও করে না। সুতরাং তারা যেহেতু কুফুরী ও শির্কের ওপর রয়েছে, তাই আপনার অন্তরে তাদের প্রতি ভালোবাসা থাকা বৈধ নয়।

তৃতীয় স্তর: জেনে রাখুন! কাফেরদের প্রতি موالاة (মুআলাত) তথা ভালোবাসা পোষণ করা কখনো মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দিতে পারে। আবার কখনো তাদের প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব পোষণ করা হারাম হতে পারে। কাফেরদের প্রতি মুওয়ালাত (ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব) দুই প্রকার। (১) মুওয়ালাত কুবরা ও (২) মুওয়ালাত সুগরা।

১. মুওয়ালাত কুবরা: কাফেরদের প্রতি মুওয়ালাত কুবরা পোষণ করা কুফুরী। এটাকে পূর্ণ মুওয়ালাত এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করাও বলা হয়। এটা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এই প্রকার মুওয়ালাত কুফুরী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ﴾

“হে ঈমানদারগণ! ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে সেও তাদের মধ্যে গণ্য হবে।” (সূরা আল মায়েদা ৫:৫১)

কয়েকটি কাজের মাধ্যমে এই প্রকার মুওয়ালাত হয়ে থাকে।

(১) কাফের-মুশরিকদেরকে তাদের দীনের কারণে ভালোবাসা।

(২) কাফের-মুশরিকদের কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

(৩) তাদেরকে কাফের ও মুশরিকদেরকে কাফের না মনে করা। চাই তারা ইহুদী হোক বা নাসারা হোক অথবা অগ্নিপূজক হোক অথবা অন্য কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হোক।

(৪) কাফের-মুশরিকদের মাযহাবকে সঠিক মনে করা।

(৫) যারা সুস্পষ্ট কাফের-মুশরিক, তাদের কুফুরীতে সন্দেহ পোষণ করা।

(৬) কাফের-মুশরিকদের ধর্মের প্রশংসা করা।

এর সাথে মুসলিমদেরকে ঘৃণা করার বিষয়টাও যোগ হতে পারে। কিছু কিছু মুসলিম আছে, যারা মুসলিমদেরকে ঘৃণা করে। তারা চায়, কাফেররা মুসলিমদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলুক এবং ইসলামের ওপর কুফুরী জয়লাভ করুক। নিঃসন্দেহে এটা ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়। এটা কুফরী হওয়ার একাধিক দলীল রয়েছে।

(১) আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ﴾

“আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে সেও তাদের মধ্যে গণ্য হবে”। (সূরা আল মায়েদা ৫:৫১)

(২) আল্লাহ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করাকে মুনাফেকদের লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ﴾

“যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তুমি তাদেরকে এ বলে তাদের সাথে মিলিত হতে দেখবে যে, আমাদের আশঙ্কা হয় যে, আমাদের ভাগ্যে বিপর্যয় ঘটবে”। (সূরা আল মায়িদা ৫: ৫২)

(৩) আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে বন্ধু বানানোর ব্যাপারে বলেছেন, যে, সেটা ঈমানের সাথে একত্রিত হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ﴾

“তারা আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি এবং যা কিছু তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তাতে ঈমান আনয়ন করলে, তাদেরকে বন্ধু বানাতো না।” (সূরা আল মায়িদা ৫: ৮১)

(৪) হাতেব বিন আবু বালতাআ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন একটি অপরাধ করেছিলেন, তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন,

وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ